হুচ্

একটি সমন্বিত প্রয়াস

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৪

হুচ্

সম্পাদক
আলোড়ন খীসা

সম্পাদনা সহযোগী
দীপন চাক্‌মা

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৪

মুদ্রণ
পুনশ্চ, ২৭৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট
কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

যোগাযোগ
সেল ফোন : ০১৬৭০ ৭০১২০৯, ই-মেইল : alokhisa@gmail.com
www.chtbd.org

মূল্য
৫০.০০

০৫
সম্পাদকীয়
০৬
অরণ্য থেকে অন্তর্জালে, রাঙা মাটির পথ থেকে রাজপথে : আদিম অন্যতার জমিন ঘুরে দেখা
প্রশান্ত ত্রিপুরা
১৭
আদিবাসীভাষায় সাহিত্যচর্চা : একটি উপলব্ধির অনুবাদ
হাফিজ রশিদ খান
২২
‘ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী; আমরা ক্ষুদ্র নই মোটেই’
ফিডেল ডি সাংমা
২৬
চেতনার এনজিওকরণ
পাইচিংমং মারমা
৩১
প্রান্তিক স্বর দ্যোতনায় উপনিবেশিক বিদ্রোহ
রুদ্র শায়ক
৩৬
জেমস্ জর্নেশ চিরান এর কবিতা
৩৭
হিমেল রিছিল এর কবিতা
৩৯
পাহাড়ি সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
অজল দেওয়ান
৪৬
ঘুণে ধরা জুম্ম আদিবাসী সমাজের কিছু কথা
এডিসন চাকমা
৫৬
ফেরা
সুমেধ তাপস চাক্‌মা
শিশির চাকমার কবিতা ৫৮
স্বাগতম চাকমার কবিতা ৬০
ফারবান্নে না ওয়াঙজা-এর কবিতা ৬২
আলোড়ন খীসার কবিতা ৬৫
সুদীপ্ত চাকমা মিকাডোর কবিতা ৬৭
হেগা চাক্‌মার কবিতা ৭০
আশা চাক্‌মার কবিতা ৭৫

সম্পাদকীয়

আরো আগেই বেরুনোর কথা ছিলো 'হুচ্'র কিন্তু খাগড়াছড়ির তেন্দং-এ সাম্প্রতিক পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলা তা আর হতে দেয়নি। বরাবরের মত এবারও আমাদের তরুণ লেখক গোষ্ঠী হাতে হাত বেঁধে কাজে নেমে গেছে, তাই আমাদের 'হুচ্'র বেরুতে দেরি হয়ে গেলো। ত্রাণ সংগ্রহের কাজ অন্যান্যবারের মত এবার তেমন মসৃণ ছিলো না, বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি আমাদের আঁকড়ে ধরেছিলো। তারপরও আমরা আমাদের মত কাজ করে গিয়েছি। সফলভাবে ত্রাণ বিরতরণসহ অবহেলিত কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে সহযোগীতা করতে পেরেছি। এবার কাগজ প্রসঙ্গে আসা যাক-'হুচ্' প্রথম সংখ্যা ১ম বর্ষ যখন পাঁচ বছর আগে বের করি তখন নামের সংজ্ঞায়ন নিয়ে বিস্তারিত লিখেছিলাম, ২য় সংখ্যায় সেটা আর করা হয়নি। এরপর অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেছেন 'হুচ্' মানে কি? এই ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় এসে 'হুচ্'-এর সংজ্ঞায়ন আবার নতুনভাবে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি যেহেতু অনেকেই জানেন না এর মানে কি। 'হুচ্' একটি চাকমা শব্দ, যার অর্থ চিহ্ন। এই অস্থির এবং বিভেদপূর্ণ সময়ে সততা, সাহিত্য আর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতি সচেতনতা আর ভালোবাসা থেকেই আমাদের এই প্রয়াস, এই সমাজ এবং সাহিত্য চিন্তার কাগজ 'হুচ্'। আমরা আমাদের চিহ্ন এই সময়ে ফেলে যেতে চাই, আমরা কিছু কাজ করতে চাই যা অন্যদের চাইতে আলাদা। কারণ আমরা দেখেছি, আমাদের সাহিত্য যতটা না প্রসারিত হয়েছে তারচে বেশী প্রভাবিত হয়েছে, তা বুঝা যায় বর্তমান সাহিত্য কাগজগুলো পড়লেই। আমরা তার পক্ষে নই। সরাসরি রাজনীতি দ্বারা সাহিত্য প্রভাবিত মানেই হলো সেটি বেশি বা কম করে হলেও সেটি সেই রাজনীতির কথাই বলবে যার দ্বারা সে প্রভাবিত। আমরা কারো রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত নই। আমরা বলতে পারি আমাদের মনের কথাগুলো, আমাদের আমজনতার কথাগুলো। কিন্তু এই কথাগুলো মানুষের কাছে তো পৌঁছাতে হবে, তাই আমাদের চিন্তার সাথে অন্যদের চিন্তার মেলবন্ধনে এই কাগজ। আমরা মনে করি শুধু লিখেই নয়, এর প্রসার ও প্রচারেও আমাদের দায়িত্ব অনেক তাই এই কাগজের লেখকরা শুধুই লিখেই ক্ষান্ত দেন না, তারা সমাজের অনেক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করে থাকেন। আমরা মনে করি আমরা একই পরিবারের সদস্য এবং শুধুমাত্র লিখেই যে আমাদের দায়মুক্তি হবে তা আমরা মনে করিনা। আর আমাদের প্রকাশনা নাম কামাতে নয়, মানুষের মনজাগাতে, ভাবাতে। আমরা বিশ্বাস করি, কেউ আমাদের গোণা'য় নিক আর না নিক আমরা মনের গহীন গহ্বর থেকেই কাজ করছি, তাড়না থেকে করছি, আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের জন্য। মোদ্দাকথায় এটি একটি লিটল ম্যাগাজিন। আমরা জুম্মো সাহিত্যের অচলপ্রথা আর এই বর্তমান সময়ের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে কিছু বলতে চাই। এই বলা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে, কারো পক্ষে নয়, কারো সাহায্যে নয়। কিন্তু আমরাও নিরপেক্ষ নই, আমরা প্রগতির পক্ষে, একতার পক্ষে।

অরণ্য থেকে অন্তর্জালে, রাঙা মাটির পথ থেকে রাজপথে আদিম অন্যতার জমিন ঘুরে দেখা

প্রশান্ত ত্রিপুরা

'অন্যতা' একটি প্রেক্ষিত-সাপেক্ষ নির্মাণ, একটি দ্বৈততার এক দিক, যার আরেক দিক হচ্ছে 'স্বকীয়তা' বা 'আপন সত্তা'। এই লেখাতে 'অন্যতা'কে দেখা হয়েছে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের চোখ দিয়ে, যে শ্রেণিকে ঘিরে- তার উপরে, নীচে ও পাশে- রয়েছে কৃষক, শ্রমিক, শাসকগোষ্ঠী, বিদেশি, এমন বিভিন্ন বর্গের 'অন্য'রা। এই প্রেক্ষিতে 'আদিম অন্যতা' নির্দেশ করে আদিবাসী'দের অবস্থান, শিক্ষিত শ্রেণির বাঙালিদের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা একাধারে 'আদিম' ও 'অন্য'। উল্লেখ্য, যে কোন বাংলা অভিধান উল্টালেই 'আদিবাসী' শব্দের যে অর্থ এখনো পাওয়া যায়, তা হল, 'আদিম জাতি বা অধিবাসী'। এই 'আদিম' পদটিকে খুঁজে পাওয়া যায় মোটা দাগে বিরাজমান একটা বিভাজন রেখার এক পাশে সমগোত্রীয় অন্যান্য আরো বেশ কিছু পদের কাতারে- যাদের মধ্যে আছে অসভ্য, জংলি, বন্য, বর্বর, উপজাতি ইত্যাদি- যেগুলির বিপরীতে রয়েছে সভ্য, আধুনিক, জাতি/রাষ্ট্র ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত ভেদরেখাগুলোর প্রেক্ষিতে 'আদিম অন্যতার জমিন' বলতে এই নিবন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে আদিবাসী জীবনের উপস্থাপনা সম্বলিত পরিসরকে, যেটিকে পাখির চোখে এক নজর দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের দৃষ্টিকোণ থেকে। আলোচনার সুবিধার্থে 'শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' বর্গগুলিকে আমরা আন্তঃসম্পর্কিত ও সমরূপ হিসাবেই ধরে নেব, এবং যেসব বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখকদের কাজের নমুনা আমরা দেখব, মোটা দাগে তাঁদেরকে আমরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হিসাবেই ধরে নেব, যদিও তাঁদের সবাইকে নান্দনিক বা মতাদর্শিকভাবে এ ধরনের কোন নির্দিষ্ট বন্ধনীতে আবদ্ধ করা যায় না। এই সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই আমরা শুরু করব একটা উদাহরণ দিয়ে- কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতার অংশবিশেষ– যেখানে 'বাঙালি' বর্গের একটা প্রচলিত সীমানা চোখে পড়ে:

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?- পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্‌ফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো!

উপরের উদ্ধৃতাংশের তৃতীয় পংক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় বাংলাদেশের ইতিহাসে সু-পরিচিত একটি স্লোগানের কথা, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান, বাংলার খ্রিস্টান- আমরা সবাই বাঙালি।' অন্যদিকে, শেষ দুই পংক্তিতে যেসব নাম রয়েছে, সেগুলো 'বাঙালি' গণ্ডির বাইরে : একদিকে পার্সী, জৈন, ইহুদী, কন্‌ফুসিয়াস, চার্বাক-চেলা প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়; অন্যদিকে সাঁওতাল, ভীল ও গারো, এই তিনটি জাতি, বাঙালিদের কাছে যাদের পূর্বপরিচিতি ছিল আদিবাসী বা আদিম হিসাবে। নজরুল অবশ্য উল্লিখিত সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের অভিন্ন মানবতার উপরই জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে 'জাতীয় কবি' হিসাবে ঘোষণা করা বাংলাদেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী ধারাগুলো আবর্তিত হয়েছে একদিকে বাঙালিত্বের জয়গানে, আরেকদিকে মুসলমান পরিচয়কে এগিয়ে রাখার মাধ্যমে। এই দুটি ক্ষেত্রের কোনটাতেই আদিবাসীরা নিজেদেরকে খুঁজে পায় না। এই ধারাবাহিকতারই অংশ ছিল শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে ওঠা সেই বিতর্কিত স্লোগান, "তুমি কে, আমি কে? বাঙালি, বাঙালি"।

নিবন্ধের প্রেক্ষাপট ও কাঠামো নিয়ে দুটি কথা বলে নেই। শিরোনামের পদগুলি- অরণ্য, অন্তর্জাল, রাঙা মাটির পথ, রাজপথ- খুব একটা ভেবে চিন্তে বাছাই করা হয় নি, তবে মাথায় খেলা করছিল ২০১৩ সালের আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে এক নাগাড়ে কয়েকটা লেখায় হাত দিতে গিয়ে। উল্লেখ্য, আদিবাসী দিবসকে সামনে রেখে হুচের জন্যও একটা কিছু লিখব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম আগেই। তবে হুচের জন্য নির্ধারিত লেখাতে হাত দিয়েছিলাম সবার শেষে। ইচ্ছে ছিল, সময় পেলে হুচের জন্য ভিন্নধর্মী কিছু লেখার চেষ্টা করব, হুচের আগের সংখ্যায় যে প্রশ্ন আমি তুলেছিলাম- আদিবাসী কবি বা কবিতা বলে কিছু আছে কিনা- সেই সূত্র ধরে ব্যাপকতর পরিসরে 'সংস্কৃতির সীমানা' ধরনের কোন বিষয়ে আলোচনা করব। এ ধরনের একটা আবছা ধারণা মাথায় নিয়ে আগে হাত দেওয়া নিবন্ধগুলি লেখার সময় যেসব বিষয় বা অনুচ্ছেদ মনে হচ্ছিল 'হুচ্'-এর সাথে বেশি যাবে, সেগুলো সরিয়ে রাখছিলাম। মূলত এভাবেই আকার পেয়েছে বর্তমান নিবন্ধটি।

ব্যবহৃত পদগুলিকে দেখা যেতে পারে এক ধরনের 'খুঁটি' হিসাবে, যেগুলির পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারের মাধ্যমে (অরণ্য, রাঙা মাটির পথ, রাজপথ ও অন্তর্জাল) নীচে তুলে ধরা হল এক নজরে আমার দেখা আদিম অন্যতার জমিনের রেখাচিত্র।

অরণ্য

বাঙালি মানসে 'আদিবাসী' পরিচয় আর 'অরণ্য' মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে। যেমন, এক সময় বাংলাদেশে গড়পড়তা শিক্ষিতজনদের জন্য আদিবাসীদের সম্পর্কে জানার প্রধান

উৎস ছিল আবদুস সাত্তারের লেখা 'আরণ্য জনপদে', 'আরণ্য সংস্কৃতি', 'আরণ্য প্রেম' প্রভৃতি বই। আবার পড়াশোনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা রয়েছে, এমন বাঙালিদের মধ্যে আদিবাসীদের সংগ্রাম সম্পর্কে সংবেদনশীলতার পাঠ নেওয়ার একটি প্রধান উৎস হল মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'। অবশ্য বাঙালি মানসে আদিবাসী বলতেই 'আরণ্য জনপদ' বোঝালেও, 'অরণ্য' মানেই যে সবসময় আদিবাসী-অধ্যুষিত ভূমি বোঝায়, তা নয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় যে অরণ্য ফেরত চেয়েছেন, সেখানে রয়েছে তপোবন, গোচারণ, সামগান প্রভৃতি। যে কাব্য-ভূমির বিলুপ্তি নিয়ে কবিগুরুর হাহাকার, তা যতটা না অরণ্য, তার চাইতেও আসলে একটি সামন্ত জনপদ, যা আর্যাবর্তেরই অংশ, যেখানে কোন 'অনার্য' আদিবাসীর উপস্থিতি চোখে পড়ে না।

আসলে, সে অর্থে কোন মানব সমাজই ঠিক অরণ্যে বাস করে না। বাইরের মানুষদের চোখে অরণ্যবাসী, এমন সমাজের লোকেরাও নিজেদের বেলায় একটা ভেদ রেখা মেনে চলে অরণ্য এবং লোকালয়ের মধ্যে। অথচ আদিবাসী মানে 'প্রকৃতির সন্তান', 'অরণ্যের অধিবাসী' – এমন দৃষ্টিভঙ্গির ধারক-বাহক-প্রবক্তারা সচরাচর এই মৌলিক বিষয়টা জানেন না বা খেয়াল করেন না। এঁরা বিবেচনায় নিয়ে আমরা বলতে পারি, 'জংলি' শব্দের নেতিবাচক ব্যঞ্জনা এড়াতে গিয়ে কেউ যদি 'অরণ্যচারী' ধরনের পদ ব্যবহার করে, তাতেও এই ধারণাগত অসঙ্গতিটা রয়েই যায়। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সময় 'জঙ্গলের মানুষ' কথাটা প্রায়ই শোনা যেত স্থানীয় মানুষদের মুখে (ত্রিপুরারা বলত 'বলংনি বরক', চাকমারা 'ঝারবুয়া'), যা দিয়ে বোঝানো হত শান্তিবাহিনীকে! নীচে আমি আরো দুটি উদাহরণ দেব যা দিয়ে বন বা অরণ্যের সাথে 'আদিবাসী'দের অবিচ্ছেদ্য করে দেখার সমস্যাটা বোঝা যাবে।

প্রথম উদাহরণটা হচ্ছে '১৩তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান' নামে অন্তর্জালে পাওয়া একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর। আগে প্রশ্নটা, ও সাথে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলি, দেখে নেয়া যাক:

'বন্যেরা বনে সুন্দর,শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' এ উক্তিটির প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে–
ক. আদিবাসী মানুষ অরণ্য জনপদে বাস করে
খ. বনের পশু বনে থাকতে ভালবাসে
গ. জীব মাত্রই স্বাভাবিক অবস্থানে সুন্দর
ঘ. প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য আদি ও অকৃত্রিম

সঠিক উত্তর হিসাবে কোনটা দেখানো হয়েছে, তা আমরা একটু পরে জেনে নেব। তার আগে অন্য একটা উদাহরণ দেখে নেই। সেটা হল, 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে', এ বিষয়ে 'অষ্টম নবম দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের' জন্য দৈনিক ইত্তেফাকে (১৫ মে, ২০১৩) আব্দুল্লাহ আল মামুনের লেখা একটি ভাবসম্প্রসারণ। নীচে সেখান

থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল:

> সৃষ্টিজগতে সবকিছুই নিজ নিজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অনুপমতা পায়। অরণ্যচারী মানুষ আরণ্যক জীবনেই পায় স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্য। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিজস্ব পন্থায় তারা প্রকৃতির সাথে জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি গড়ে তুলে। তাদের জীবন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে আরণ্যক পরিবেশের সাথে যোগসূত্র ও সঙ্গতি রেখে। অরণ্যলালিত সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনেই তারা পরিতৃপ্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশেই এরা মানানসই।

উপরের উদ্ধৃতিতে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছে, মোটা দাগে তার সাথে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। তবে অরণ্যচারী মানুষ ঠিক কারা, কেন বা কি অর্থে তারা 'অরণ্যলালিত সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনে পরিতৃপ্ত', তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বনাঞ্চলে যে মানুষেরা বাস করে, দুই শতাধিক বছর ধরে তাদেরকে টিকে থাকতে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হিংস্রতার সাথে। এখানে আমরা বাঘ-ভালুকের কথা বলছি না, বরং বলছি 'রাষ্ট্র' ও 'বাজার' নামক মানব ইতিহাসের দুইটি চিড়িয়ার কথা, যেগুলো পৃথিবীর সব কিছু গিলে খেয়েই চলছে।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক চতুর্থাংশ ভূমি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, যেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রবেশ দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ রাষ্ট্র ঠিকই বৈধ-অবৈধ বিবিধ উপায়ে এই বনগুলির বিনাশ দেখে আসছে। অন্যদিকে 'অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন' নামে চিহ্নিত পাহাড়ি ভূমিতে স্থানীয়দের জুমচাষের অধিকার থাকলেও সেজন্য প্রয়োজনীয় ভূমি খুব কমই এখন তাদের জিম্মায় রয়েছে। এ অবস্থায় 'সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ও পরিতৃপ্ত অরণ্যচারী মানুষ' পার্বত্য চট্টগ্রামে কতজন আছে, বলা মুশকিল। (উপরে বিসিএস পরীক্ষার যে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে, তার সঠিক উত্তর দেখানো আছে 'গ'।)

রাঙা মাটির পথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানে 'গ্রামছাড়া যে রাঙা মাটির পথ' মন ভুলিয়ে দেয়, তা কোন আদিবাসী পল্লীর সাথে যুক্ত কিনা বোঝার উপায় নেই। তবে কাজী নজরুল ইসলামের 'এই রাঙা মাটির পথে লো' গানে যখন মাদল আর বাঁশি বেজে ওঠে, মহুয়ার বনে চাঁদের মাতাল হাসি লুটিয়ে পড়ে, তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা একটা আদিবাসী জনপদে- সুস্পষ্ট করে বললে 'সাঁওতাল' এলাকায়- আছি। নজরুল ছাড়াও আরো বেশ কিছু বড় মাপের বাঙালি কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সাঁওতালদের জগতকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের সৃজনশীলতার প্রেরণা, পটভূমি বা বিষয় হিসাবে। সে সূত্রে মাদলের তাল, বাঁশির সুর আর হাড়িয়ার মাদকতা সহযোগে নৃত্যগীত-উৎসবে মেতে থাকা সাঁওতাল নারী পুরুষদের যূথবদ্ধ জীবনের একটা রোমান্টিক প্রতিচ্ছবি অনেকের মানসপটে

গভীর ছাপ দিয়ে আঁকা আছে, যা কারো কাছে আদিম সারল্যের প্রতিমূর্তি, বা সুদূর অতীতে ফেলে আসা কোন পূর্বতন সত্তা বা ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছায়া। এ ধরনের রূপায়ণে ইতিহাসের কোন প্রতিফলন নেই, নেই বাস্তব জীবনের বৈষম্য, নিপীড়ন বা প্রতিরোধের কোন ছাপ। যদি প্রতিরোধের চিত্র কখনো উঠেও আসে, তা সচরাচর আটকে থাকে ঐতিহাসিক স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে একটা চিরন্তন ছকে।

শিল্প বা সাহিত্যের আদিবাসীরা তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, যদিও বাস্তবে তাদের সমকালীন প্রতিনিধির অনেকের হাতে একে-৪৭-এর মত অস্ত্র দেখা গেছে! অর্থাৎ বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পীদের চিত্রায়নে আদিবাসী জীবনের যে ছবি তুলে ধরা হয়, বাস্তবতার সাথে তার খুব কমই মিল দেখা যায়। সংস্কৃতির এ ধরনের উপস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার আলোকে, যেক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল ২০১০ সালের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন', যার মাধ্যমে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে 'উপজাতীয়' শব্দটির বদলে বসে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'। একই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে যুক্ত হয় '২৩ক' ধারা, যার মাধ্যমে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের' সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিকাশের দায় রাষ্ট্রের উপর এসে বর্তায়।

উল্লিখিত দায় রাষ্ট্র কীভাবে মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছে তার কিছু নমুনা স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল জুলাই ২০১৩-তে। নজরুলের গান শুনে রাঙা মাটির পথে শাল পিয়াল মহুয়া বনের চন্দ্রালোকিত মদির পরিবেশে মাদলের তালে অঙ্গে ঢেউ ওঠা যে আদিবাসী নারী আমাদের কল্পনায় ধরা পড়ে- একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি সেরকম নারীর কিছু নব্য সংস্করণ শিল্পকলা একাডেমীর পিচ ঢালা রাস্তায় নাচতে নাচতে প্রধান অতিথি ও অন্যদের বরণ করছিলেন একটা অনুষ্ঠানে। আর নজরুলের গানে যে মাদল বাজতে শুনি আমরা, সেরকম কিছু বাদ্যযন্ত্র, সাথে তীর ধনুক, আদিবাসী নারীদের পরিধেয়- এসব দিয়ে সাজানো ছিল উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধিত হওয়া 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সংগ্রহশালা'। শিরোনামে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' আছে, এমন একাধিক বইও ছিল সেখানে। আদিবাসীদের 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য'কে এভাবে ইতিহাস-বিযুক্ত সংগ্রহশালা, মঞ্চ, প্রদর্শনী মাঠ, এবং গ্রন্থে বেঁধে ফেলার আয়োজন আসলে চলে আসছে সেই পাকিস্তান বা ব্রিটিশ আমল থেকেই। প্রশ্ন হল, 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'রা কি শুধু নাচবে গাইবে, আর সংগ্রহশালায় তুলে দেবে তাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ, নাকি তারা ভূমি ও বনের উপর তাদের হারানো অধিকারও ফিরে পাবে? শেষোক্ত বিষয়ে সংবিধানের ২৩ক ধারা সম্পূর্ণ নীরব।

রাজপথ

ঐতিহাসিকভাবে সামন্ত ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এদেশের আদিবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছে বারবার। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল।

পরবর্তীকালে ইতিহাসের অভিঘাতে তাদের মধ্যে যারা ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে নগরমুখী হয়েছে, হয় শ্রমিক-কর্মচারী হিসাবে, নতুবা শিক্ষার্থী অথবা 'বাবু' শ্রেণির অংশ হিসাবে, তারাও অনেকে বিভিন্ন সময়ে রাজপথে নেমে এসেছে বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে। কিন্তু আদিবাসীদের ব্যাপারে বাঙালি সমাজে প্রচলিত বদ্ধমূল কিছু ধারণা এই 'রাজপথের আদিবাসী'দেরকে ঠিকমত তুলে ধরা বা বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে একটা বাধা হিসাবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে একটা ছোট উদাহরণ দেব আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে।

রাঙামাটির লংগদুতে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর তার প্রতিবাদে ২১ মে তারিখে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের একটা অভূতপূর্ব প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথে। সেই মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে, তখন আমি একটা 'কবিতা' লিখে ফেলেছিলাম, যা পরবর্তীতে 'নির্বাসিত শব্দমালা' নামে ছাপা হয়েছে। সেটি শুরু হয়েছে এভাবে :

> হে আমার নির্বাসিত শব্দমালা-
> মিছিলের শত শত আলোড়িত হৃদয়ে তোমাদের ডাক এসেছে।
> শতাব্দীর বঞ্চনার বিস্ফোরণোন্মুখ ক্ষোভে তোমরাও হও শামিল।

মজার ব্যাপার হল, অন্তর্জাল ঘাটতে গিয়ে কয়েকমাস আগে আমি হঠাৎ আবিস্কার করলাম, আমার কথাগুলির সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে বসে আছেন এম এ মোমেন নামে একজন, যিনি প্রথম আলোতে প্রকাশিত তাঁর এক লেখায় 'নির্বাসিত শব্দমালা' বলতে বুঝেছেন 'আদিবাসীদের বিপন্ন ভাষা', এবং আমি এ নিয়ে হাহাকার করলেও তা যে প্রকাশ করছি বাংলায়, এ কথা ভেবে বিষণ্ন আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন : 'বাংলার অবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার চেয়ে ভালো, অন্তত আদিবাসী ভাষাগুলোর চেয়ে তো বটেই, নতুবা আদিবাসী কবি তাঁর মাতৃভাষা ছেড়ে বাংলায় কবিতার চর্চা করতেন না। প্রশান্ত ত্রিপুরা নির্বাসিত শব্দমালার জন্য আর্তনাদ করছেন বাংলাতেই।'

১৯৮৯-এর পর থেকে এদেশের 'শহুরে আদিবাসী'রা নিয়মিতই রাজপথে থেকেছে, কখনো তাদের গ্রামীণ স্বজনদের উপর সংঘটিত বিভিন্ন অত্যাচারের প্রতিবাদে, কখনো বৃহত্তর নাগরিক সমাজের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে। কিন্তু এই উপস্থিতি- বিশেষ করে শেষোক্ত ধরনের পরিস্থিতিতে- সচরাচর দৃষ্টির আড়ালেই থেকে গেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে, এবং শিল্প-সাহিত্যে আরো বেশী। পক্ষান্তরে, 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' জাতীয় অনুষ্ঠানে, বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে, আদিবাসীরা যখন 'ঐতিহ্যবাহী' (আদি/ম) সজ্জায় হাজির হয়, তাদের উপস্থিতি সবার নজরে পড়ে, প্রশংসা কুড়ায়। এভাবে চলতে থাকে স্থান-কাল নিরপেক্ষ ভাবে বিশেষ ছাঁচে জনপরিসরে আদিবাসীদের উপস্থাপিত হওয়ার, বা স্ব-উপস্থাপনার, ধারা।

অন্তর্জাল

এখানে অন্তর্জাল বলতে বোঝানো হচ্ছে 'ইন্টারনেট'কে, যেখানে সমাজে বা রাষ্ট্রে বিদ্যমান বিভিন্ন বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়, আবার অনেকে নূতন রূপে নিজেদের ছায়াসত্তা বা প্রতিসত্তা তৈরি করছে। আমাদের আলোচনার যে জমিন, 'আদিম অন্যতা', তাও সেখানে তৈরি হচ্ছে নূতন রূপে। আর অন্তর্জাল যেমন আদিবাসীদের জন্য হয়ে উঠছে নিজেদের তুলে ধরার এবং প্রতিপক্ষদের মোকাবেলা করার নূতন সীমান্ত, তেমনি অন্যরাও যে যার মত করে মাঠে রয়েছে আদিম অন্যতার জমিনে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায়, যার যার মতাদর্শিক, ব্যবসায়িক বা অন্যান্য স্বার্থের অনুকূলে। এসবের প্রেক্ষিতে কিছু বিষয় বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। যেমন, আদিবাসীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার অন্তর্জালে দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা মোকাবেলা করতে হবে পরিকল্পিতভাবে, বিভিন্ন কৌশল খাটিয়ে। আর এক্ষেত্রে অন্তর্জাল একটা সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্ব জুড়ে মিত্রতা ও সহযোগিতার নূতন সম্পর্কজাল তৈরি করতে। তবে আমি মনে করি সে সুযোগ ঠিকমত কাজে লাগাতে গেলে 'আদিবাসী' পরিচয়কে 'আদিম অন্যতা'র নিগড় থেকে বের করে নিয়ে এর সার্বজনীন আবেদনকে সামনে নিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ সমকালীন প্রেক্ষাপটে 'আদিবাসী' পরিচয়কে নূতন অর্থ ও মাত্রা দিতে হবে। বিষয়টা আমি একটু ব্যাখ্যা করব আমার নিজের সাম্প্রতিক একটা উপলব্ধির আলোকে। আমি 'আদিবাসী' শব্দটা নিয়ে ছোট বেলায় কখনো খুব বেশী মাথা ঘামিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। তবে কিশোর বয়সে লেখা নিজের একটা কবিতায় আমি এটা খুঁজে পেয়েছি। 'ওপার' নামে এই কবিতার শুরুটা এরকম :

> এই মাঠটাকে হঠাৎ, কাজ করতে করতে
> মনে হল বড় বেশি ফাঁকা, ধূ ধূ-
> চলে গেলাম নদীটার ওপাশে,
> ওই পারের সবুজ বনে, নীল পাহাড়ে।
>
> সেখানে আমি গত দিনগুলিতে
> ফসল ফলিয়েছি,
> গতকালও আমি আদিবাসী ছিলাম–
> সেখানে জুমচাষ করেছি।
> [ঢাকা, ১৯৭৯]

যে সময় আমি কবিতাটা লিখেছিলাম, তখন আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার, এই দুটি ভূমিকার মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া, যেভাবে সময় ও পরিপার্শ্ব ঠিক করে দিয়েছিল। সে অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বুয়েটে ঢুকলাম তড়িৎ প্রকৌশলী হওয়ার চিন্তায়। সেখানে একটা ছাত্র সংগঠনে যোগ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়া, রাত জেগে পোস্টার লেখা, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে বছরখানেক জড়িত থাকার পর হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম একটা বৃত্তি, তাও আবার এমন একটা দেশে, যেটির কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা

বলে স্লোগান দিতাম! আমি যে দল করতাম, সেই দলের নেতা, যিনি এখন গার্মেন্টস কারখানার মালিক বলে শুনেছি, এ নিয়ে ভীষণ ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। যাহোক, বিদেশে পাড়ি দিলাম কম্পিউটার বিজ্ঞানী হবার চিন্তা করে... কিন্তু আট বছর পরে ফিরে এলাম অর্ধপক্ক এক নৃবিজ্ঞানী হিসাবে। যাহোক, নৃবিজ্ঞান পড়া ছিল আমার জন্য আত্মানুসন্ধানের অংশ, যা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে আমি শুরু করেছিলাম নিজের আত্মপরিচয়ের পরতগুলো খোলার কাজ। তাতে প্রথমেই আবিষ্কার করলাম, যেভাবে নিজেকে চিনতে শিখেছিলাম, তার পেছনে রয়েছে বাঙালি 'বাবু' শ্রেণির আরাধ্যজনেরা- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ। সেই পরত খুলতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম 'পশ্চিমা'দের- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে শুরু করে বার্ট্রান্ড রাসেল, মার্ক্স, ফ্রয়েড, কত কি। সেই উন্মোচনের প্রক্রিয়া এখনো চলছে!

উপরে উদ্ধৃত নিজের কবিতাটা যখন আমি ফেসবুকে দিয়েছিলাম গত বছর কোন এক সময়, অনেকের কাছ থেকেই বেশ ভাল সাড়া পেয়েছিলাম, যাদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে কানাডা- পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অনেক বন্ধু ছিলেন- কেউ বাঙালি, কেউ চাকমা, কেউবা ত্রিপুরা বা গারো, ইত্যাদি। তাঁরা কি কেউ নিজেকে আদিবাসী ভাবেন? অস্ট্রেলিয়া বা কানাডাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া যেসব 'আদিবাসী'রা অভিবাসী হয়েছেন, তাঁদের সাথে সেসব দেশের- বা নিজের দেশের- 'আদিবাসী'দের চলমান সংগ্রামের যুক্ততা কি? যাঁরা যুক্ত থাকতে চান, হতে চান, তাঁদের জন্য তা করার সর্বোত্তম উপায় কি? অন্তর্জাল আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বহু বন্ধুর সাথে অন্তরের জ্বালা, প্রশ্ন ইত্যাদি ভাগাভাগি করে নিতে। আমার কাছে এমন কিছু প্রশ্ন হল, 'আদিবাসী' পরিচয়ের তাৎপর্য কি? 'আদিবাসী' অধিকারের কথা আমরা যখন বলি, তখন নিজেদের কথা ভেবে কি তা আমরা করি? আর আমরা যারা সোচ্চার হই বিভিন্ন সময়ে- যেমন যখন শুনি সুজাতা বা সাগরি নামের আদিবাসী নারী-শিশু ধর্ষকদের হাতে প্রাণ দেয়, আর এই রাষ্ট্র দোষীদের খুঁজে পায় না- কিছু বিবৃতি, মানববন্ধন, বা ফেসবুকে কবিতা পোস্ট করা, এসবেই কি আমাদের দায় শেষ? আর দায়টা কি শুধু আদিবাসীদেরই?

বাকি কথা

'বাঙালি মানসে আদিম অন্যতার জমিন' কতটা বা আদৌ তুলে ধরতে পেরেছি কিনা, তা বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিলাম। এক্ষেত্রে পাঠকদের রায় যাই হোক, তাঁদেরকে অনুরোধ করব আমার লেখাটিকে একটা আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে দেখতে। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি সেটা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হন, তাহলে তা হবে আমার জন্য বাড়তি পাওনা। এ প্রসঙ্গে পাখির চোখে আদিম অন্যতার জমিন দেখতে গিয়ে শুধু দূর থেকেই চোখে পড়েছে, এমন কিছু পল্লবিত স্থানের কথা উল্লেখ করছি যেগুলো আরো কাছ থেকে দেখার দরকার আছে। সেসব জায়গায় বড় মাপের গাছের মত দাঁড়িয়ে আছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

ইলিয়াসের জীবদ্দশায় আমি একবার তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম, তাঁর সাথে কথা বলেছিলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু তাঁর 'চাকমা উপন্যাস চাই' প্রবন্ধটা আমার পড়া হয়ে ওঠে নি এখনো। তাঁর প্রত্যাশা কি হতে পারে, এবং কেন তিনি তা উচ্চারণ করে থাকতে পারেন, সে ব্যাপারে আমার একটা ধারণা আছে, তবে তাঁর লেখাটা না পড়ে কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তাই সে প্রসঙ্গ এখন থাক। এখানে আমি বরং ইলিয়াস সম্পর্কে ফারুক ওয়াসিফের একটা মূল্যায়ন তুলে ধরছি, যা প্রাসঙ্গিক: 'ক্ষুদ্র, তুচ্ছ মানুষের জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্য যে অপার সম্ভাবনা ধরে, তাকে তিনি সাহিত্যের মধ্যে নির্মোহভাবে ফলিয়ে দেখান।' উদ্ধৃত বাক্যের উপর আমার চোখ আটকে গিয়েছিল 'ক্ষুদ্র' শব্দটা দেখে, যেটার সাথে সাংবিধানিকভাবে আদিবাসীরা বাঁধা পড়ার পর তা এখন তাদের অনেকের কাছে হয়ে উঠেছে তাদের যাবতীয় বঞ্চনা, বেদনা ও ক্ষোভের- তাদের প্রতি রাষ্ট্রের ও বাঙালি বিদ্বৎসমাজের অবজ্ঞার - মূর্ত প্রতীক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বেঁচে থাকলে নিশ্চয় 'ক্ষুদ্র' নামে আখ্যায়িত এই মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, এ নিয়ে কলম ধরতেন। আমার বিশ্বাস, তাঁর চোখে আদিবাসীদের সংখ্যাগত ক্ষুদ্রতা নয়, বরং তাঁদের জীবনাদর্শের মহত্তই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাঙালি বিদ্বৎসমাজের মানসিক সংকীর্ণতা, বা ক্ষুদ্রতা, অবশ্য তাঁকে নিশ্চয় অবাক করত না, যদিওবা হয়ত ব্যথিত করত, যেহেতু তিনি নিজেও এর অংশ ছিলেন।

আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিকভাবে বরাদ্দকৃত অন্য একটা শব্দ হল 'নৃগোষ্ঠী', যার সাথে জড়িয়ে আছে সেলিম আল দীনের নাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বিভাগে পড়াতেন, সেই বিভাগের একজন শিক্ষক আমাকে গর্বের সাথে বলেছিলেন, 'নৃগোষ্ঠী' শব্দটা নাকি তাঁদেরই উদ্ভাবন ছিল। সেলিম আল দীন ছিলেন বাংলাদেশে 'নিও-এথনিক থিয়েটার'- বাংলায় নব্য নৃগোষ্ঠী নাট্য- চর্চার পথিকৃৎ বা প্রবক্তা। তার মানে বাংলাদেশের আদিবাসীরা যে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'র মত একটা খটমটে নামের সাথে বাঁধা পড়ল, এটা তাঁদেরই অবদান? সেলিম আল দীন এখনো বেঁচে থাকলে আমি তাঁকে অবশ্যই প্রশ্নটা করতাম। মারমা রূপকথা, কেরামত মঙ্গল, বনপাংশুল প্রভৃতি নাটকের স্রষ্টা, যেগুলি জুড়ে আছে আদিবাসীদের জীবন, জগত, 'মর্মরিত ভগ্ন অরণ্যের ভেতর উচ্চারিত রক্তাক্ত জনপদের পাঁচালি', তিনি নিশ্চয় শুনতে পেতেন 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' পদের মধ্যে মিশে থাকা বাঙালি উন্নাসিকতার সুর? সহজ বাংলায় বললে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'র অর্থ দাঁড়ায় 'ছোট জাতের মানুষ' বা 'ছোট মানুষের জাত'- এগুলি যদি আপত্তিকর হয় তবে তৎসম পদটা কেন হবে না? 'জংলি' শব্দটা যাদের কাছে নেতিবাচক অর্থ বহন করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি পাল্টে যাবে 'অরণ্যবাসী' বা সেরকম কোন শব্দ চালু করা হলে?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা সেলিম আল দীন বেঁচে নেই, কিন্তু আমাদের মাঝে আছেন মামুনুর রশীদ। তাঁর 'রাঢ়াং' নাটকটা ভাল করে এখনো দেখা হয়ে ওঠে নি আমার, তবে এটির সম্পর্কে নীচের কথাগুলি পড়ার পর মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে এটি দেখার বা নাট্যকারের সাথে আলাপের সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাতে হবে :

রাঢ়াং অর্থ জেগে ওঠার জন্যে দূরাগত মাদলের ধ্বনি। আদিবাসীরা দূরাগত মাদলের ধ্বনিই শুনছে বহুকাল ধরে। কিন্তু তাদের মুক্তি নেই। ভূমির অধিকার বঞ্চিত এই আদিবাসীরা বার বার লড়াইয়ে মেতে উঠেছে। কিন্তু মুক্তি পায়নি। নাচোল বিদ্রোহ থেকে আলফ্রেড সরেনের ভূমির অধিকার লড়াই পর্যন্ত বিস্তৃত এর কাহিনী। আলফ্রেড সরেনের উত্থান ও নিষ্ঠুর হত্যায় এর পরিসমাপ্তি।

আলফ্রেড সরেনের মৃত্যু, বা রাঢ়াং-এর পরিসমাপ্তি, নিশ্চয় আদিবাসীদের সংগ্রামের শেষ কথা হতে পারে না। এই সংগ্রাম চলছে, চলবে। প্রশ্ন হচ্ছে, মামুনুর রশীদের নাটক, বা আপনার আমার দু'একটি কবিতা, বা মানববন্ধন- সেগুলোর আয়োজন যত আন্তরিকভাবেই করা হোক, এগুলো কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বাংলাদেশের মাটি থেকে খুমিদের নীরব প্রস্থান, বা বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য ছাড়া চাকদের গ্রামছাড়া হওয়া? এই ঘটনাগুলো যে ঘটছে, বাংলাদেশের কয়জন মানুষ খবর রাখে? কারা এই খুমি বা চাক? তারা হল ক্ষুদ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম নৃগোষ্ঠী। মানুষ হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, কারো চাইতে তাদের অধিকার কম নয়। তবে তার বাইরেও তাদের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের উচ্চতার সর্বোত্তম পরিমাপক কি হতে পারে? আমার কাছে এর উত্তর হল : খুমি, চাক বা মান্দাইদের মত জাতিদের টিকে থাকা না থাকা, ভাল থাকা না থাকা- এদেশের সাহিত্যে, শিল্পে, এবং মাটিতে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. 'নজরুল রচনাবলীর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংকলন: শ্রেষ্ঠ নজরুল'। আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পাদিত। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।

২. এই লেখাগুলির মধ্যে ছিল "আদিবাসী ধারণা নিয়ে সরকারি আপত্তির ভূত এবং বিশ বছর আগের কিছু কথা", "একটি মাঠ, দুইটি গোলক ও একটি গোলকধাঁধা: আদিবাসী দিবসকে ঘিরে আমার কিছু ভাবনা" এবং "আরণ্য জনপদের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সনদের ছায়াতলে: বাংলাদেশে আদিবাসী পরিচয় পুনর্নির্মাণের দুই দশক (১৯৯৩-২০১৩)", যেগুলি যথাক্রমে একটি তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্র সংগঠনের সংকলন, সান্ত্রআ জার্নাল ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের 'সংহতি'তে প্রকাশিত হয়েছে। শেষের দুইটি নিবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত ব্লগে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে : http://ptripura1.wordpress.com/

৩. উল্লেখ্য, বর্তমান নিবন্ধের একটা সংক্ষিপ্ততর রূপ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এই লেখকের ব্যক্তিগত ব্লগে, যেটির ঠিকানা উপরে দেওয়া হয়েছে (২ নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪. কবিতাটি আমি দেখে নিয়েছি উইকিসংকলনে (২৪/৭/১৩-তে):

৫. http://bn.wikisource.org/wiki/ সভ্যতারপ্রতি

৬. http://goo.gl/xxqOkR (জুলাই ২৬, ২০১৩-তে নামানো)
http://goo.gl/PJIAiu (জুলাই ২৬, ২০১৩-তে নামানো)

৭. নজরুলের 'রাঙা মাটির পথে লো' গানটার সুর ও কথা থেকে এটি যে 'সাঁওতালি' ঘরানার, এ ব্যাপারে আমার অনুমানের সমর্থন আমি পেয়েছি অনুপ সাদির ব্লগে 'বাংলা গানে সাঁওতালি সুর' (জুলাই ১, ২০১৩) একটা পোস্ট থেকে, http://goo.gl/fMqg5z, যার সন্ধান অন্তর্জালে পাই ২৪/৭/১৩ তারিখে।

৮. এ প্রসঙ্গে ফেসবুকে আমি একটা নোট দিয়েছিলাম, 'সরকারি সংগ্রহশালা কি হতে যাচ্ছে আদিবাসীদের ঐতিহ্যের শেষ গন্তব্য?' শিরোনামে (জুলাই ৯, ২০১৩), যা পরে একটি ব্লগে দেওয়া হয়েছে: http://chtbd.org/?p=2041

৯. এম এ মোমেন, 'জীবিত ভাষার মরণযাত্রা: বহু ভাষার বাংলাদেশ', ফেব্রুয়ারি ৩, ২০১২, http://goo.gl/jupYrt (মার্চ ১৬, ২০১৩-তে নামানো)

১০. 'ইন্টারনেট'-এর পারিভাষিক বাংলা প্রতিশব্দ 'অন্তর্জাল' হবে নাকি 'আন্তর্জাল' হবে, এ নিয়ে একটা বিতর্ক চলমান রয়েছে দেখলাম। গুগল সার্চের ভিত্তিতে প্রথমটার দিকেই পাল্লা ভারী মনে হয় (৩:১ অনুপাতে)। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা কোনটাকেই যথার্থ বা ব্যাকরণসম্মত মনে করেন না। আমি এসব যুক্তিতর্কের কোনটার মূল্যায়নে না গিয়েই 'অন্তর্জাল' শব্দটাকে বেছে নিয়েছি, যার ধ্বনিগত দ্যোতনা আমার প্রেক্ষিতে সবচেয়ে জুতসই মনে হয়েছে।

১১. 'চাকমা উপন্যাস চাই' নামের লেখাটা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধ সংকলন 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু'তে আছে, যার প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স।

১২. শ্রদ্ধাঞ্জলি নয় এই স্মরণ বরং প্রতিবাদ হিসাবেই গণ্য হোক, ফারুক ওয়াসিফ (৪ জানুয়ারি ২০১০), http://nirmaaan.com/blog/faruk-wasif/5808

১৩. সাইমন জাকারিয়া (আগস্ট ২০০৮) বাংলাদেশে নিও-এথনিক থিয়েটার চর্চার পথিকৃৎ, http://goo.gl/PYPT3f

১৪. মামুনুর রশীদ, নাটক সমগ্র ৩, নালন্দা (২০১৩) http://goo.gl/L1trZ3

আদিবাসীভাষায় সাহিত্যচর্চা
একটি উপলব্ধির অনুবাদ

হাফিজ রশিদ খান

মাতৃভাষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত

পৃথিবীর সাধারণ-অসাধারণ কোনো মানুষেরই চেতনায় এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা বিতর্ক থাকার কথা নয় যে, পৃথিবী নামক গ্রহের প্রতিটি মানুষের তার মাতৃভাষায় বলা, লেখা ও চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে। একদিক থেকে বললে আজকের দিনটি পর্যন্ত তাই-ই হয়ে আসছে। মাঝে-মধ্যে দু'একটি সময় ও দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা ছাড়া। মাতৃভাষায় জীবনযাপনের দাবিতে বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকে আজকের বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এবং ষাটের দশকে ভারতের বরাক উপত্যকার (আসামের শিলচর) বাংলাভাষীরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। অতঃপর তারা অধিপতি প্রতিপক্ষের রোষানলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বভাষা ও স্বজাত্যবোধের পরিচয় উৎকীর্ণ রেখেছে ইতিহাসের পাতায়। একদিক থেকে এ জাতীয় ঘটনাকে ইতিহাসের ব্যতিক্রমী অভিক্ষেপ বলে শনাক্ত করা চলে। অনেক ঐতিহাসিকও তাই বলেন। ভাষার অধিকার রক্ষার ব্যাপারটি যখন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক শোষণ-নিপীড়নের পুঞ্জীভূত অবদমনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে শাসক বা ক্ষমতা-তখ্তের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে, তার বিচার-বিবেচনা হয় ভিন্নমাত্রিক। যেমন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে উপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বহুবিধ বঞ্চনা আর নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে জড়িত ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার অবমাননার বিরুদ্ধে আন্দোলনটি।

সেই একই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতি ষাট-বাষট্টি বছরের আগেকার তুলনায় অনেক, অনেক বদলে গেছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ের চেয়ে এখনকার বাংলাদেশের সকল স্তরের শিক্ষিত, সচেতন নাগরিক এদেশে সুদূর ঐতিহাসিককাল থেকে বিভিন্ন আদিবাসী জাতিসত্তার বিদ্যমানতা বিষয়ে অনেক বেশি তথ্যসমৃদ্ধ, সংবেদনশীল ও পারস্পরিক যোগাযোগপ্রত্যাশী হয়ে ওঠেছে। পাকিস্তান আমলে যে-বিষয়টি ছিল পাথুরে দেয়ালের মতো অভেদ্য, অপরিচিত ও আগ্রহহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সুবাদে সে দেয়াল এখন অপসৃত, আলোকিত ও অনেকখানি প্রসারিত বললেও অত্যুক্তি হবে না। গণমাধ্যমের সময়োপযোগী উন্নতি ও বিস্তৃতি, একবিংশ শতকে

তথ্যভাণ্ডারের অবারিত বিমুক্তি, সর্বোপরি, স্বদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সচেতনতাবৃদ্ধির বাস্তবতা ও তাদের জীবনধারার বৈচিত্র্য সংরক্ষণের আওয়াজ একালের নাগরিককে নিঃসন্দেহে ভাবায়। দেশজ মানবসত্তাসমূহের ঐকতানে মাঙ্গলিক রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে। আমার ধারণা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এই হলো এক লহমায় অনেকগুলো প্রাপ্তির যোগফলের একটি উজ্জ্বল সমীকরণ।

যে কোনো প্রাপ্তিই আরও বহুল প্রাপ্তির পাটাতন তৈরি করে। তৃপ্তির বৃত্তভাঙা আরও অগ্রসর পদচারণার প্রেরণা নিয়ে আসে। আত্ম-উপলব্ধির দিগন্ত প্রসারিত ও উন্মুক্ত করে দেয়। নতুনতর জীবন নির্মাণ ও সম্ভাবনার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে আরও। এ সবের কোনোটাই অদ্ভুতাত্মক, অনৈসর্গিক কিংবা অমানবীয় স্বভাব-চরিত্র নয়। এ তো জীবনেরই গতি, যাপনেরই অন্তর্গত উৎসার। এ নিরিখেই বাংলাদেশের আদিবাসী জনমানুষের ভেতর এসেছে প্রথা ও লোকাচার, সংস্কৃতি ও জীবনাচার বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাচেতনার প্রসার, সে সবের প্রতি রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বা দায়বদ্ধতা। এ প্রসঙ্গে এও স্মরণ করা দরকার, উল্লিখিত চেতনামথিত বিষয়গুলোর উন্মেষ ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক উন্নততর সংস্কৃতি বা জীবনযাপনের মিথস্ক্রিয়ায়। অন্যথায় ওই প্রসংগগুলো কিছু গুহামানবের চিরকালের অবদমিত অথচ ভাবিত বিলাপে পর্যবসিত হয়ে কালের অতল গর্ভে হারিয়ে যেত। আদিবাসী সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, পাহাড় ও পাথরের গায়ে হয়তো তা উৎকীর্ণ হয়ে আছে আজও– যার পাঠোদ্ধার কোনো কালেই আর সম্ভব হবে না হয়তো। কিন্তু যার রেশ রয়ে যায় যৌথ অবচেতনার ভেতর অলক্ষেই। কাজেই আজকের সম্বুদ্ধ, সমকালীন ভাবঝড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল আদিবাসী তরুণ-যুবা কিংবা তাদের অগ্রজরা যখন আপন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে তাদের মাতৃজবান, পাহাড় ও ঝিরি-ঝরনার আবহে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত তাদের লোকস্বরকে নবপ্রাণদানে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তখন তা সময়ের স্বভাবকে প্রতিহত করে না। বরং তাতে বীক্ষণ এভাবে প্রোথিত হয় যে, এ হলো নতুন কালের আচরণ, নতুন পৃথিবী ও নব তথ্যপ্রবাহের সংগে অভিযোজনের ঐকান্তিক উদ্ভাসন।

উত্তর-কাঠামোবাদীরা (পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট) বলছেন, একটি বড় কোনো শামিয়ানার নিচে সকল মানুষকে একীভূত করে রাখার বিংশ শতকীয় কিংবা তার পূর্বেকার দৃষ্টান্তের আর কোনো কার্যকারিতা এখন আর নেই। এ প্রত্যয়ের ভেতর মানুষের মধ্যে প্রাপ্তব্য সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি যৌক্তিক পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়েছে। যেখানে জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক– এমন কি স্থানিক স্বাতন্ত্র্যের কথাও অনুক্ত থাকে না। সম্ভবত ওই দার্শনিক অভিঘাতের আদলেই ফিলিপাইন, ভারত, বাংলাদেশ ও আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে সেসব দেশস্থিত আদিবাসীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষার তাগিদে নানা পরিপ্রেক্ষিতের চুক্তি বা সমঝোতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

চাকমাভাষা ও সাহিত্য

ঠিক এই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আদিবাসী সমাজের আলোকিত অংশ যখন নিজেদের মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার কথা বলে, তা আর তেমন বিসদৃশ ঠেকে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রসংগটাই আপাতত এখানে বোধগম্যতার খাতিরে উপস্থাপন করা যায়। ওখানকার চাকমা সমাজ ইদানীন্তন সময়ে তাদের সাহিত্য সংস্কৃতিভিত্তিক ভাবনাগুলোকে তাদের নিজস্ব ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত করতে আগ্রহী। ধর্মীয়, সামাজিক কি সাংস্কৃতিক তৎপরতায় বিভিন্ন ছোট ছোট মুদ্রিত অভিব্যক্তিতে তাদের উপর্যুক্ত অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা গল্প নাটক ইত্যাদি সৃজনশীল উদ্যোগ-আয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়ও চাকমা ভাষায় নিয়মিত ছেপে বেরুচ্ছে রাঙামটি কিংবা খাগড়াছড়ি থেকে। এ রকম কয়েকটি সাহিত্যপত্রের নাম প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যায়, যেমন: রেঙ (আওয়াজ বা ধ্বনি); কাজলী (অনুরোধ); রানজুনি (রংধনু); রেগা (সেতুবন্ধন); হুচ (চিহ্ন) প্রভৃতি। এ কাগজগুলো ছাড়াও চাকমা ভাষায় দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমার কাব্যগ্রন্থ 'পাদারঙ কোচপানা' (সবুজাভ ভালোবাসা); সুহৃদ চাকমার 'বার্গী' (হৈমন্তিক পাখি); কবিতা চাকমার 'জ্বলি ন' উধিম কিত্তেই' (জ্বলে উঠবো না কেন); মৃত্তিকা চাকমার এ্যাংকুর (পুনরায়); মেঘ' সেরে মোনো চুক (মেঘপাহাড়) প্রকাশিত হয়েছে।

চাকমা ভাষার কাব্যিক স্ফূর্তি ও ব্যঞ্জনার সামান্য খোঁজ নিতে এখানে শিশির চাকমার একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বাংলা হরফে মুদ্রিত চাকমা উচ্চারণভঙ্গি সমৃদ্ধ কবিতাটির শিরোনাম 'চিত্ মন আর ন ভিজে' (হৃদয়ে আর প্রশান্তি নেই) :

ধবধবা জুনোপহ্‌রে মৌন মুরো ভিঝি যায়
ভিজি যায় কলগ' আদাম,
ঝরত ভিচ্চে পেগো সান, বেগ পেঝেরা
তুয়্য কার' দুনদুগ নেই।
জুনো পহরর সদচ্চে আল্যাঙে
বেক্কুনে নিগুচ্ আমলি।
সে জুনোপহ্‌রে চিত্মন আর ন' ভিজে।

যে মৌন মুরোত ইত্তোকুদুম-শিঙোর পালু
আবুঝি রইয়্যেন মাদি কামেরে, পিরিত্তুন পিরি
জুমে জুমে বেড়েয়োন, লাঙেলর পধ রাঙেয়োন
ছড়াথুম মাদেয়োন মেলোনী পাদার ন' ভাঝেয়োন,
এচ্চে সে মৌন মুরো কেযান অচিন অচিন
বিশ্বাচহারা সদিভাঙা মিলে দগ
আন্দলে আন্দলে চোগপিঝি রিনি চায়,
সেই মৌন মুরোত চিত্মন আর ন' ভিজে।

পত্তিদিন পত্তে আমল্লে পেগো কোলকালিত
ঘুম ভাঙি যায়

কধ পেগে গীদ গান, কধ পেগে হচ্চে সুগে উড়ি বেড়ান
ইরুক বেন্নে ঘর কেবার মেলিলে
উদোনত ইজোরত মৌন মুরো কলগত
থল ভুইয়োত ছড়াছড়ি গাং পাড়ত
বানা কবা ঝাক, খারখাজ্যে আবাজ অনসুর
এ খারখাজ্যে আবাজত চিত্মন আর ন' ভিজে

[আলোড়ন খীসা সম্পাদিত 'হুচ' এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যা থেকে, পৃ. ৬৮]

তবু যেখানে জোর দিতে চাই

কবিতাটির নিরাভরণ অথচ বেদনামথিত প্রবাহে চাকমাভাষা জানা পাঠকের মনে যে-অনুরণন সৃষ্টি হয়, তা নিশ্চয় গভীর অনুধাবনের। কবিতাটিতে অতীতমুগ্ধতার আচ্ছন্নতা যেমন আছে, সেই অতীতের সম্পন্নতা হারিয়ে রিক্ততার বিলাপও আছে। পাশাপাশি বৃহত্তর পাঠকের সংগে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে কবিতাটিতে নৃগোষ্ঠীগত ভাষার সীমাবদ্ধতাও উঁকি দেয় মনে বড় করে। সাহিত্যের যে-কোনো সাম্য যেই হোক না কেনো, বৃহত্তর পরিসরে এসব ভাষার গণ্ডিবদ্ধ আকার-আকৃতি সংবেদী পাঠকের নজর পড়েই। অন্যদিকে চাকমা মারমা ত্রিপুরা তনচংগ্যা ম্রো খুমি বম খিয়াং চাক পাংখো লুসাই বা অন্য আদিবাসী ভাষাসমূহের লিখিত সাহিত্যের অস্তিত্ব প্রায় দূরবীক্ষণিক। আবার এসব ভাষাভাষীদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় রচিত সাহিত্য পাঠকের সংখ্যা একেবারেই অত্যল্প। তদুপরি রয়েছে অঞ্চলভেদের উচ্চারণ বিভ্রাটের জালে জড়িয়ে বক্তব্য বিষয়টির বিতর্কিত ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠার সমূহ আশংকা। এ কঠিন বাস্তবতাকে সামনে রেখে হাতের কাছে থাকা কোনো পূর্ণ বিকশিত মানভাষা শিক্ষার আলোকদীপ্ত আদিবাসী সাহিত্যব্রতীদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠাটা খুব জরুরি বলে মনে হয়। হাজার বছরের শত মনীষার দীর্ঘ চিন্তন ও অনুশীলন-অনুধাবনায় গড়ে ওঠা সর্বসমন্বয়ী বাংলা ভাষা হতে পারে সেই মাধ্যম, যা কোটি-কোটি মানুষের বোধগম্যতার সঠিক চূড়াটি স্পর্শ করতে সক্ষম অনায়াসেই।

এ প্রসংগে নোবেলজয়ী কথাসাহিত্যিক চিনুয়া অ্যাচেবের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চার কারণে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছিলেন বারবার যে, তাঁর কথাসাহিত্যের বিশাল ভুবনে অতি সমুজ্জ্বল সৌন্দর্যে নাইজেরীয় গোত্রীয় জীবনদর্শন, সমাজবীক্ষণ, পুরাকালের ইতিকথা, অতীত হয়ে যাওয়া নিজের কিশোরকালের প্রতি মুগ্ধতা কতো সাবলীলভাবে চিত্রিত হচ্ছে, অথচ ওই একই বিষয় তিনি নিজের গোত্রভাষায় কেন প্রকাশ করছেন না। স্মরণ করা দরকার, চিনুয়া অ্যাচেবে ছিলেন নাইজেরীয় সমাজের ইগবু গোত্রের সন্তান আর সে গোত্রের পরম্পরা থেকে পরম্পরায় প্রচলিত ভাষার নাম-ইবু। তো উত্থিত ওই প্রশ্নের জবাবে চিনুয়া অ্যাচেবে ইংরেজি ভাষার মহাসাগরীয় ধারণক্ষমতার কথা উল্লেখ করে প্রকারান্তরে গোত্রভাষার উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাই তিনি আফ্রিকীয় জীবনধারার বঞ্চনা সৌন্দর্য অবদমন শৌর্য উল্লাস

তাৎক্ষণিকতার প্রতি ঘোরতর আসক্তি আর বৈশিষ্ট্যগত অন্যান্য সকল দিক বিশ্ববাসীর দরবারে উপস্থাপন করে গেছেন ইংরেজি ভাষার দৌত্যে, অনন্যসাধারণ কুশলতায়। এই উপস্থাপনায় তাঁর আফ্রিকীয় আইডেনটিটি মোটেই ধূসরাভ নয় বরং তা উজ্জ্বলতর। এভাবে চিরবঞ্চিত, তিমিরাচ্ছন্ন আফ্রিকার অন্দর ও অন্তরমহলের অশ্রুত বাণীর বেদনা তাঁর সুবাদে (আরও অনেকের অবদানের কথা মনে রেখেও) বিশ্ব বিবেকের দুয়ারের কড়া নেড়েছে জোরালভাবেই। তাঁর গোত্রীয় দায়বদ্ধতা, সেই সূত্রে ব্যক্তিগত বৈশ্বিক পরিচিতি একই পাটাতনে গ্রথিত হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে।

এই দৃষ্টান্তে বাংলা ভাষার ওজস্বিতা ও অসাধারণ নমনীয় প্রকাশসক্ষমতাকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এলে আদিবাসী জীবনের প্রকৃত প্রেক্ষাপট আরও বড় পটভূমে বিস্তৃতির পরিসর খুঁজে পাবে বলে আমার ধারণা। কেননা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মানবিক সকল অনুভূতির প্রকাশসক্ষম ভাষাগুলোর অন্যতম বাংলা। এর শরীরে তথাকথিত ধর্মীয়, গোত্রীয় বা জাতপাত কিংবা বর্ণবাদী কোনো তক্‌মা লাগানো নেই। এ ভাষিকসম্পদ ব্যক্তি প্রতিভাকে, সেই সূত্রে আদিবাসীদের গোত্রীয় বা যৌথ কণ্ঠস্বরের দ্যোতনাকে বিশ্বকানে পৌঁছে দিতে উদগ্রীব হয়ে আছে। এ সম্পদের সদ্ব্যবহারে এগিয়ে আসা দরকার আমাদের সময়ের আদিবাসী সাহিত্যব্রতীদের। আমার মন কেন যেন তাই বলে বারবার।

‘ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী; আমরা ক্ষুদ্র নই মোটেই’

ফিডেল ডি সাংমা

সব পাখির মতো কোকিলও পাখি। অথচ সব পাখির গুণ ওদের মধ্যে নেই; যেমন- ওরা নিজেরা বাসা তৈরি করতে পারে না। অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে। বলাই বাহুল্য- ডিমে তা দেওয়া, বাচ্চা ফুটিয়ে মমতা দিয়ে সন্তান লালনপালন করা ওদের ভাগ্যে জোটে না। অন্যান্য পাখির মতো তাদেরও জন্ম, মৃত্যু, ভাষা, আবেগ, অদ্ভুত মাতাল করা সুর আছে। কিন্তু ওদের এই সুর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য দারুণভাবে, রোমান্টিকতায় ভরা। প্রকৃতির মাঝে বসন্তকে জাগিয়ে তোলে, প্রেমকে বাঙময় করে তোলে, মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে এই কোকিলের সুর। আদিবাসীরাও মানুষ। একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীব; সবার মতোই রক্তমাংসে গড়া। নিজস্ব পরিবার-পরিজন, সমাজ-সংস্কৃতি, জন্ম-মৃত্যু, ভাষা-ধর্ম-কর্ম তাদেরও আছে; আছে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য আনন্দ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান সব। তবে এরা মানুষ প্রজাতির হলেও আলাদা কোন জাতি নয়; উপজাতি (জাতির আবার উপ হয় কি করে; এই নাম দেনেওয়ালারাই ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন)। ইদানীং উপজাতি নামটাকে আধুনিকীকরণ করে নাম দিয়েছেন- ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী’। এ জনগোষ্ঠীর লোকেরা আবার নিজেদের আদিবাসী বললে খুশি হন। বাহ! নামের কি বাহার! আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য হলো- এই সব মানুষ মঙ্গোলী-য়ান, নিগ্রোয়েট, ককেশিয়েট এবং অষ্ট্রালয়েড জাতির অন্তর্ভুক্ত (বাঙ্গালীর মতো ৪টি জাতির সংমিশ্রণে তৈরী সংকর/ পাঁচমিশালী। হাইব্রিড জাতি নয়।) এদের নাক খাটো, বোঁচা এবং চোখ ছোট। তাই বলে খাটো, বোঁচা নাক দিয়ে নিশ্বাস কম নিতে পারেন এবং ছোট চোখ দিয়ে কম দেখেন বলে কোন চিকিৎসক বা বিজ্ঞানী প্রমাণ দিতে পারেন নি। বরং জনশ্রুতি আছে- বাঙ্গালীদের তুলনায় এদের শরীরে নাকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। বাংলাদেশে গারো, চাকমা, মার্মা, রাখাইন, সানতাল, তঞ্চংগা, ত্রিপুরা, উড়াঁও, চাক্, কোচ, বর্মন, খন্ড, খাড়িয়া, খুমি, খাসি, খিয়াং, অহমিয়া/আসাম, গন্ড, গুর্খা, ডালু, পাংখু, পাহাড়িয়া, পাহান, পাত্র, বানাই, বাগদি, বিদিয়া, ম্রো, মনিপুরী, মুন্ডা, তুরী, মাহাতো, মুসহর, মরিয়ার, মাহালী, মালো রাজবংশী, কর্মকার, কোল, ক্ষত্রিয়, রাই, রাজুয়ার, লুসাঁই, সিং ও হাজং ইত্যাদি মোট ৪৫টি জাতিসত্ত্বা বাস করে।

আমাদের দেশ এখন বৃটিশ নয়, ভারতও নয়, নয় পাকিস্তান। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ছে ৪২ বছর। বাংলাদেশ হওয়ার আগেই (পাকিস্তান আমলে) আমার জন্ম। তাহলে

আমাকে কি বলবেন, আমি পাকিস্তানী? কিংবা বাংলাদেশের সকল নাগরিক পাকিস্তানী? নিশ্চয়ই না। যাই হোক, বাঙ্গালীদের আগে বা পরে এ দেশে (বাংলাদেশে) কে, কখন আসলো গেলো এর উপর ভিত্তি করে আদিবাসীর সংজ্ঞা দেওয়া হয় না, উচিতও না। এ জাতিসত্তার মানুষ নাগরিক হিসেবে অবশ্যই বাংলাদেশি, কিন্তু জাতি হিসেবে কোনোভাবেই বাঙ্গালী নয়। এ দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিতির জন্য বড়জোর এদের বাংলাদেশি গারো, বাংলাদেশি চাকমা, বাংলাদেশি মার্মা, বাংলাদেশি রাখাইন, বলা যেতে পারে; তবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতির জন্য বাংলাদেশি কথাটি যোগ করা নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালী যেমন শুধুই বাঙ্গালী, তেমনি চাকমা, মারমা, রাখাইনও শুধুই চাকমা, গারো, মারমা, রাখাইন। এর সাথে জাতি, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় জাতীয় বিশেষণ লাগানোর কোন প্রয়োজন দেখিনা- এমন কি আদিবাসী শব্দটিও নয়। বাংলাদেশে বসবাসকৃত এ সংখ্যালঘু জাতিরা নিজেদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতির দাবি করে আসলেও আজও সে পায় নি এবং খুব সহজে স্বীকৃতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। অথচ আদিবাসী সংক্রান্ত যুক্তি/সংজ্ঞা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। গর্বে আমার বুক ফুলে যায়, আমাদের ঐতিহাসিক অসীম সাহসিকতার কথা, আমাদের অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকা, চেতনায় মিশে থাকা প্রতিবাদের ভাষার কথা। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে আমাদের এ জাতির সংগ্রামী পূর্বপুরুষরাই এ ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে ১ম বিদ্রোহ শুরু করেছিল। বেঁচে থাকার প্রেরণা পাই যখন ভাবি, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০), গারো বিদ্রোহ (১৭৭৫-১৮০২, ১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩, ১৮৩৭-৮২), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০০), খাসিয়া বিদ্রোহ (১৭৮৩), ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২-১৮৩০), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৫৭), তেভাগা বিদ্রোহ (১৯৪৬-১৯৪৭), টংক বিদ্রোহ, নাচোল বিদ্রোহের কথা। অথচ এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী বাংলাদেশ সরকার এ বীর সাহসী জাতির নাম দিলেন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। দেশের নাগরিক হিসাবে সংখ্যায় আমরা কম হতে পারি, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র নই; আমাদের মন, মানসিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, স্বপ্ন, সাধ কোনদিনও ক্ষুদ্র ছিল না, ক্ষুদ্র এখনও নয়।

আমাদের মন, মানসিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, স্বপ্ন, সাধ ক্ষুদ্র না হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে হতাশও হয়ে পরছি; যখন ভাবি, আমাদের এ দেশেই পশুপাখিদের জন্য বিশেষ দিবস উদ্‌যাপিত হয়; বিজ্ঞাপন, স্লোগান, পোষ্টার, লিফ্‌লেট, ব্যানার, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড হয়, কিন্তু আদিবাসীরা মানুষ হলেও তাদের জন্য কোন দিবস উদ্‌যাপন করাতো দূরের কথা; আমরাও যে এ জন্মভূমির মানুষ, এ দেশের নাগরিক; এটাই স্বীকার করা হয় না। তা হলে প্রশ্ন এসে যায়, দেশের ১৭ কোটি জনগণ এবং ১৩ কোটি ভোটার কি আমাদের বাদ দিয়ে? এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, লোকজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য আনয়নে কি আমাদের কোনই অবদান নেই? বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের

অংশগ্রহণের কি কোন মূল্য নেই? দেশ-সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে শ্রীবৃদ্ধি করলেও, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কেউ কেউ জীবন দিলেও, বর্তমান সরকারী দলে প্রতিমন্ত্রী, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ের আসনে দায়িত্বপালন তথা দেশ গঠনে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবদানের অংশীদার হলেও দেশের ৪৫টি জাতিগোষ্ঠীর এ অবদানের কোন স্বীকৃতি মিলেনি; যে কারণে আদিবাসীদের বুকে জমাট বাঁধা দুঃখ-কষ্ট, দাবি, আন্দোলন। বাঘ, ভালুক, সিংহরা পশু জাতির; তেমনি দোয়েল, ময়না, ময়ুরদেরও পাখি জাতীয় বলতে বা স্বীকৃতি দিতে কারোর দ্বিধা-অসুবিধা নেই, কিন্তু বাংলাদেশের গারো, চাকমা, বম, ত্রিপুরা এমন ৪৫টি জাতিগোষ্ঠীর জাতি স্বীকৃতি দিতেই যত দ্বিধা, ততধিক আপত্তি। তাতে কি? বড়কথা হচ্ছে, আমরাও রক্তমাংসে, আবেগ-অনুভূতিতে সবার মতই আমরাও মানুষ। আমরা সন্তান জন্ম দিলে কোন শিশু গরু-ছাগল হয়ে জন্ম নেয়নি তো।

কবে যেন অনলাইন পত্রিকা বাংলাদেশনিউজ২৪.কম-এ একদিন পড়ছিলাম, আদিবাসী-বিষয়ক সংসদীয় ককাসের উদ্যোগে "আদিবাসীর মানবাধিকার ও আইএলও কনভেনশন ১৬৯:আত্মপরিচয়ের অধিকার ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি" বিষয়ক এক আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, ''এ সরকার আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবে তা বিশ্বাস করতে পারছি না। গত ৩৯ বছর ধরে দেখছি, শাসকগোষ্ঠী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার অধিকারী হতে পারেননি, সাম্প্রদায়িক রয়ে গেছেন। শাসকগোষ্ঠী এখনো প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হতে পারেননি"। সন্তু লারমা বলেন, ১৩ বছর আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগেই শান্তিচুক্তি হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির পর ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও তা বাস্তবায়নে কেউ এগিয়ে আসেন নি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এবার ক্ষমতায় এসেও চুক্তিটি বাস্তবায়নে একটি পদক্ষেপও নেন নি। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে সচেতন বলেও মনে হয় না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও বাঙ্গালী স্বাধীনতার কী স্বাদ তা পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থানকারী এই দেশ বাংলাদেশ ঋণমুক্ত হতে পারল না; কোনদিন পারবে বলেও মনে হয় না। বিচার ব্যবস্থায় অনিয়মের কারণে জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তি দ্বন্দ্ব কলহ অবস্থা থেকেও কোনদিন মুক্ত হতে পারছেন না জনসাধারণ। আইন শৃংখলা বাহিনী সকল মানুষের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতেও চরম ব্যর্থ; এমন আরো কত কী সমস্যা! যেখানে শুধু একটা জাতি (বাঙ্গালী)-র মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা ও মানুষের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে যেখানে ব্যর্থ সেখানে আরো ৪৫টি জাতি যোগ হলে সে ব্যর্থতার দায়ভার বেড়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। দেশের প্রতিটি মানুষ সুস্থ-শান্তিতে থাকে– তা প্রমান দিতে না পারলে নোবেল, শান্তি পুরষ্কারের মত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পুরষ্কার, ডিগ্রি অর্জন যেখানে সম্ভব হবে না, আন্তর্জাতিক মহলে

সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। সেখানে আরো ৪৫টি জাতি যোগ হলে সে ব্যর্থতার দায়ভার নেওয়ার কোন যুক্তি থাকে কি? হয়তবা একারণেই এ দেশের সরকার কোন দিন এই ৪৫টি জাতির স্বীকৃতি দেবে না, তা নির্বাচনের আগে দলীয় ইশতেহারে পিছিয়ে থাকা এই অবহেলিত জাতির জন্য অতি লোভনীয় সুন্দর সুন্দর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি কিংবা জাতি স্বীকৃতি দেওয়ার মত যত যাই বলা হোক।

বাংলাদেশের এই ৪৫টি জাতিগোষ্ঠীর ভাই-বোনদের বলি, আমরা কেন শুধু সাংবিধানিক জাতি স্বীকৃতির আশায় মাথা ঠুকছি? কি হবে জাতি স্বীকৃতি দিয়ে? দেশের সংবিধানটি দেশের প্রতিটি জনগণের দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য কতটুকু কাজে লাগে? দেশের অধিকাংশ জনগণ এখনো একদিন হরতালে পরেরদিন অনাহারে দিন কাটায়। নিজেরদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়। আর এটাও ভাবুনতো– আমাদের স্বজাতি গারো, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরারাও কি এই দেশে কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশে, প্রদেশে বর্তমান সরকারি ও বিরোধী দলে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থায় বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য উচ্চ আসনে দায়িত্ব পালন করছে না? তাহলে আমরা পিছিয়ে থাকবো কেন? কিসের, কার আশা ভরসায়?

তথ্যসূত্র

১. গণতন্ত্র ও সুশাসন এবং আদিবাসীদের অধিকার- সঞ্জীব দ্রং
২. মহাকাব্যেও অগ্রন্থিত কবিতা : মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী– চারু হক
৩. বাংলাদেশের গারো আদিবাসী– সুভাষ জেংচাম
৪. বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী– সঞ্জীব দ্রং।
৫. জাতিসংঘ ও আইএলও কর্তৃক ঘোষিত ঘোষণাপত্র।
৬. নেত্রকোনার আন্দোলন : গারো বিদ্রোহ
৭. উইকিপিডিয়া, মুক্তকোষ

চেতনার এনজিওকরণ

পাইচিংমং মারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে আশঙ্কিত হওয়ার মত যে ব্যাপারগুলো ঘটছে তা হল ক্ষুদ্র জনজাতি সমূহের (আমি এখানে জুম্ম নামে উল্লেখ করতে চাই) স্বাধিকার আন্দোলন এখন ভাতৃঘাতী হানাহানিতে বিপর্যস্ত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ও তরুণ-ছাত্র যুবকরা রাজনীতিবিমুখ। যে তরুণ সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা তারা নাক-মুখ ডুবিয়ে আছে ভোগবাদী নর্দমায়, আত্মকেন্দ্রিক জীবনবোধের বৃত্তে সমাজ-জীবনবিমুখ সুখ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষায়। অনেক শিক্ষিত স্নাতক জুম্ম তরুণ এনজিও-তে ঢুকছে। এখানে যুক্তি হতে পারে এনজিও-তে চাকরি করা খারাপ কিনা? বা পাহাড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেখানে নেই বললেই চলে সেখানে এনজিও-গুলো ব্যাপকসংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে, ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। এখানে আমি বলতে চাই আমি কর্মসংস্থানের বিপক্ষে নই। কিন্তু এনজিও-তে চাকরির ফলে সমাজে একটা সমাজ মনন গড়ে ওঠে যা আমাদের জুম্ম সমাজে যেখানে আমরা অস্তিত্বের লড়াইয়ে লড়ছি, তার ক্ষতি হয়। একটা ঘটনা দিয়ে বলি- আমাদের ছোট কাগজের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে আমরা একটা বিশ্লেষণধর্মী লেখা দিতে বলি (সে একজন জুম্ম Prominent ছাত্র) সে আমাদের জানিয়েছিলো আমাদের প্রকাশনার জন্য বিশেষ করে আদিবাসী ইস্যুতে প্রকাশনার নামে আমরা যদি এনজিওদের কাছ থেকে কিছু ফাও যোগাড় করতে পারি যা দিয়ে একজন লেখকের পারিশ্রমিক দিতে পারি।

সমস্যাটা এখানেই। একজন ঢা.বি.-এর জুম্ম ছাত্র সামাজিক দায়বোধ থেকে লিখতে চায় না, সে এনজিও'র Incentive নিয়ে লিখতে আগ্রহী। একইভাবে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, জুম্ম সংস্কৃতি রক্ষা তথা বিকাশ, এমনকি পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন পর্যন্ত আমাদের জীবনের গুরুতর কোন ইস্যু যেন আজকাল এনজিও-দের সাহায্য ছাড়া হয়ে চায় না। আমাদের আত্মপরিচয়ের তত্ত্ব-তালাশ, আত্মস্বীকৃতি এমনকি আমাদের অস্তিত্বরক্ষার দায়ভার আমরা এনজিও-দের উপর ন্যাস্ত করেছি। এর ফলাফল কি হবে? বাঁচার সংগ্রাম,আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের সংগ্রাম, অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম মানুষের সহজাত। ত্রিধাবিভক্ত জুম্ম জনগণের এই সংগ্রাম আজ বিভক্ত-বিভ্রান্ত। একদিকে অস্তিত্ব রক্ষার জঙ্গি লড়াই যেমন গড়ে উঠছে না, অন্যদিকে জুম্মদের শিক্ষিত অংশের মগজ কিনে নিয়েছে এনজিও'গুলো।

ফলে এইসব ইস্যুতে যা হচ্ছে তা হোল, গোলটেবিল বৈঠক, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। গণবিচ্ছিন্নভাবে মধ্যবিত্ত সুশীল-বুদ্ধিজীবীদের তত্ত্ব-তথ্য চালাচালির মাধ্যমে বিদেশি ফান্ডের শ্রাদ্ধ হতে পারে, নপুংসক কর্মসূচি হতে পারে কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের চেতনার সাথে আত্মমর্যাদা বোধের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন- 'মানুষ ক্ষুধার্ত বলেই লড়াই করবে এমনটা নয়, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ ক্ষুধা মেটানোর জন্য জীবন-সংগ্রাম করবে যার আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে ভিক্ষা বা চুরি করবে।'

অধিকারহারা অধিকারবোধসম্পন্ন মানুষ তখনই লড়াই করবে যদি তার আত্মমর্যাদাবোধ অটুট থাকে। তা না থাকলে সে বিলাপ করবে। অপরদিকে অধিকারগুলো যদি সুযোগ হিসেবে বুঝানো/ বিশ্বাস করানো যায় তখন তা আরো ভয়ংকর। মানুষ তার কপালতন্ত্রের অসহায়ত্ব মেনে একবেলা উচ্ছিষ্টে নাক-মুখ ডুবিয়ে থাকে। সুবিধা পাওয়া মানুষ তখন আরো সুযোগসন্ধানী স্বভাবে অভাব মেটায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ তখন লুম্পেন চরিত্রের হয়। তাদের দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সংগ্রাম, মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অসম্ভব।

পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশি ফান্ডের সহজলভ্য প্রবাহে অনেক এনজিও গড়ে উঠেছিলো, বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখিয়ে সেই ফান্ডের টাকা যথেচ্ছভাবে নয়-ছয় করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা অনেকেই বিত্তশালী হয়েছেন। UNDP'র মোটা বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়া অনেকে এমন এক কুলীনশ্রেণির মানুষ হয়েছেন, যারা আর সাধারণ জুম্মদের মধ্যে পড়েন না আর তারা নিজেরাও তা ভাবতে চান না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলো প্রশ্নাতীতভাবে রাজনৈতিক সমস্যা, আর্থ-সামাজিক সমস্যা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হাত যেখানে আপাদমস্তক সক্রিয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতি রায় বলেন যে - "NGO's give the impression that they are filling a vacuum created by a retreating state, And they are, but in a materially inconsequential way. Their real contribution is that they defuse political anger and dole out as aid or benevolence what people ought to have by right.NGO's alter the public psyche .They turn people into dependent victims and bluntpolitical resistance. NGO's form a buffer between sorkar and public"

অরুন্ধতি রায়ের শেষোক্ত কথাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এনজিও'রা জনগণের মননকাঠামোর একটা পরিবর্তন ঘটায়। ক্ষুধার্ত মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে কিন্তু যদি তাকে উচ্ছিষ্ট খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাতে তার বোধকে অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য আছে বুর্জোয়া মিডিয়া এবং এনজিও'দের নিজস্ব প্রচারণা ও উন্নয়ন ধারণা। এনজিও'রা রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে অরাজনৈতিক পর্দায় ঢাকে। তারা তাদের কাজগুলোকে 'অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবা' হিসেবে প্রদর্শন করে। কিন্তু কোন সামাজিক সমস্যা কি রাজনীতি মুক্ত? যৌতুক,

লিঙ্গ বৈষম্য, ইভটিজিং, ফতোয়াবাজি, মৌলবাদ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ইত্যাদি যদি রাজনৈতিক সমস্যা না হয় তাহলে রাজনৈতিক সমস্যা কোনটা? খুব সহজ যুক্তিতে আমরা জানি সমাজ-রাষ্ট্র চালায় সরকার। সরকার পরিচালিত হয় রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দর্শনে। সরকারের নারীনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদি নীতিকে সরকারের শ্রেণিদর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই সম্ভব। সুতরাং এই প্রশ্নে এনজিও'দের বিভিন্ন মাস-ক্যাম্পেইন, এডভোকেসি, এমপাওয়ারমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি প্রজেক্ট দিয়ে এইসব সামাজিক সমস্যা মেটানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে অরুন্ধতি রায়ের লেখা থেকে তুলে ধরছি :

"It turns confrontation to negotiation. It depoliticizes resistance. It interferes with local people's movement that have traditionally been self reliant. NGO's have funds that can employ local people who might other wise be activist in resistance movements, but now can feel they are doing some immediate, creating good (and earning a living while they're at it) charity offers instant gratification to the giver, as well as the receiver, but its side effects can be dangerous. Real political resistance offers no such short cuts. The NGO-isations of politics theaters to turn resistance into well-mannered, reasonable, salaried 9 to 5pm JOB with a few perks throw in. Real resistance has real consequences and no salary."

অরুন্ধতি রায়ের এ কথাগুলোর সাথে আমরা এবার পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিই। আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে যত কর্মসূচি পালিত হয় তার বেশিরভাগই এনজিও মদদপুষ্ট। এই ইস্যুতে একটি জঙ্গি আন্দোলন গড়ে উঠতে পারতো, তা হয়নি কারণ, কিছু নাগরিক মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী সুশীলরাই এই রাস্তায় নামে। বছরে একবার আদিবাসী দিবসে মহানগরের তরুণ-তরুণীরা স্বকীয় পোষাক পরে (তারা সাধারণত এটা পরেন না) রাস্তায় র‍্যালী করেন। অ-নাগরিক ব্রাত্য সাধারণ জুম্মরা যারা পাহাড়ের গহীনে আজো জুম চাষ করে বেঁচে আছেন তাঁরা এ বিষয়ে কিছু জানেন না। তাঁরা জানেন না আদিবাসী কি আর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র-জাতিসত্তা কি। দু'বেলা খাবার খেয়ে নিজের ভিটে মাটিতে থাকতে পারলেই তারা খুশি। জুম্মদের শেকড়ে মূল সংকটটা অস্তিত্বের সংকট। নিপীড়ক রাষ্ট্র সেটেলারদের সামনে ঠেলে, সামরিক মদদে নিষ্পেষিত করছে জুম্মদের। ফিলিস্তিনিদের উপরে ইসরায়েলীদের আগ্রাসনের মতোই এই রাষ্ট্র আগ্রাসন। ফলে জুম্মদের এই লড়াই জুম্মদের অধিকার প্রশ্নে রাষ্ট্রনীতি তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জুম্মরা ঐতিহ্যগতভাবে সংগ্রামী। ইতিহাস এই প্রমাণ দেয় যে, জুম্মরা যুগে যুগে লড়াই করেছে মোঘলদের বিরুদ্ধে, বৃটিশের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রশক্তি সেটেলার-আর্মি দিয়েও আজ পর্যন্ত দমাতে পারেনি জুম্মদের। কিন্তু জুম্মদের বৃহত্তর

ঐক্যের ভিতরে ঘুণপোকা হয়ে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে দলগত বিভক্তি। অধিকার আদায়ের সর্বব্যাপী আন্দোলন গড়ে না ওঠার জন্য এমপি'রা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবে দায়ী। রাজনীতির এনজিওকরণের ফলাফল তাৎক্ষণিক নয়, আখেরে এর ফল সুদূরপ্রসারী এবং মারাত্মক।

পাকিস্তানী থেকে বাঙালি হওয়ার জন্য বাঙালির এনজিও লাগেনি। অথচ জুম্মদের আদিবাসী হওয়ার জন্য এনজিও লাগে, সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য এনজিও লাগে। UNDP-সহ অনেক এনজিও পার্বত্য চট্টগ্রামে দেদারসে টাকা ঢালছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্নাতক তরুণ-তরুণী সেখানে চাকরি করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা যে মূলত রাজনৈতিক সমস্যা তা আড়াল করে সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে এনজিওদের উন্নয়ন প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়ন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার একর জমি যখন সরকারি-বেসরকারি হস্তক্ষেপে বেদখল হয়ে যায় তখন এই ইস্যুতে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে না। অথচ এই আন্দোলনে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। তরুণদের এই মেধা একই ইস্যুতে এনজিওদের প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। যারা একসময় PCP (পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ) করতেন তারা অনেকেই এখন এনজিও করেন বা নিজেরাই এনজিও খুলেছেন। অথচ তাদেরই আজ জুম্মদের নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিলো। ফলে যখন ভূমি বেদখল হয় তখন সেখানে একজন রাজনৈতিক কর্মী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে কিন্তু একজন এনজিওকর্মী এই ইস্যুতে কিভাবে Rehabilitation, Legal Aid, People empowerment, Victim support-এর নামে বিদেশি ফান্ড যোগাড় করার কথা ভাবেন। যদি সে প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী হয় তাহলে ব্যাপারটা আরো ভয়ংকর হয়। কারণ তখন সে রাজনৈতিক ইস্যুকে সজ্ঞানে রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহার করে মানুষের দুর্দশাকে নিয়ে ধান্দাবাজি শুরু করে। এক্ষেত্রে আরেক ধরনের পরিস্থিতি কাজ করে। ছাত্রজীবনে যারা রাজনীতি করতেন তারা মধ্যবিত্ত টানাপড়েন থেকে একটা চাকরি বেছে নেন। এক্ষেত্রে এনজিও-র চাকরিটা কিছুটা আপোসের হিসেবে মিলে যায়। একদিকে সমাজের জন্য কিছু করার দায়বোধ অন্যদিকে পেটের দায় এই দু'য়ের মাঝখানে এনজিও'র চাকরি একটা BUFFER হিসেবে কাজ করে। কেননা এনজিও'রা সমাজের ভালো করার কথা বলে। সুতরাং এনজিও খুলে বা প্রতিষ্ঠিত এনজিও'তে ঢুকে Indigenous Rights, Human Rights, Community Development , Community Empowerment, পরিবেশ রক্ষা, শান্তি রক্ষা ইত্যাদি বলে Project-এর মাধ্যমে সমাজের কিছু ভালো করা সাথে জীবিকা নির্বাহ করার একটা ছা-পোষা জোড়াতালি ভাবনা থেকে অনেকে এখানে ঢোকে। একই ধরনের কথা অনেক শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর ক্ষেত্রে খাটে যারা ছাত্ররাজনীতি করেননি, কিন্তু জুম্ম জাতির জন্য কিছু করতে চান। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ যুবকদের এই সমাজের জন্য কিছু করার মাধ্যমে এনজিও'দের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার ফল আখেরে ভালো হবে না। রাষ্ট্র যেখানে মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে, নিপীড়ন করে, বিদেশিদের দয়া-দাক্ষিণ্যের টাকায় তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। নিপীড়নের প্রতিকার আর অধিকার

আদায় শুধু লড়াই করেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে অধিকার আদায়ের দাবিতে জুম্ম জনতাকে একত্রিত করার কাজটা সঠিক আদর্শিক শক্তিতে বলীয়ান রাজনৈতিক দলের করার কথা। সেটা পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন আর নেই। জুম্মদের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলো নিজেরদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলায় বিপর্যস্ত। জুম্মদের জাতীয় জীবনে তাই বিরাজ করছে বিভ্রান্তি, আত্মকেন্দ্রিকতা, নিষ্ক্রিয়তা, রাজনীতিবিমুখতা। একটি প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক দলের প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও প্রগতিশীল আন্দোলন থাকলে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত জুম্মরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হতো। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনও গড়ে তোলা সম্ভব, যার মাধ্যমে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল গণমুখী সাংস্কৃতিক, মননশীলতার চর্চা করা যায়। এ ধরনের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকাতে সেখানে এনজিও'রা বাসা বেঁধেছে। ফলে আমরা চেতনার এনজিওকরণের শিকার হচ্ছি।

সেটেলার-আর্মিদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা, নির্যাতন, দখল, লুটপাট, ধর্ষণের বিরুদ্ধে যারা একসময় শ্লোগানে শ্লোগানে রাজপথ কাঁপিয়েছেন তারা এখন সুশীল, এনজিও'দের গোলটেবিলে চলে গেছেন। কেউ বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিপীড়ক ব্যবস্থার অংশ হয়ে গেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। এনজিও কর্মসূচির নেতিবাচক প্রভাবটা হচ্ছে তা লড়াকু জ্বলন্ত চেতনায় জল ঢেলে দেয় এবং রাজপথের লড়াই ও অরণ্যের প্রতিরোধ সংগ্রামকে আপোস-মীমাংসার গোলটেবিলে নিয়ে যায়। অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে শান্তিপূর্ণ দেন-দরবারের মতো বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অধিকার দেন-দরবার করে, দর কষাকষি করে পাওয়া যায় না। যারা এনজিও'তে দশটা-পাঁচটা অফিস করে জুম্মদের অধিকারের কথা বলছেন তাদেরকে বলি, অধিকারের চাকরি করে অধিকার পাওয়া যায় না। অধিকার অর্জন করে নিতে হয়। অধিকার লড়ে, কেড়ে নিতে হয়। রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে এনজিওকরণের অর্থ রাজনীতির এনজিওকরণ। যার ফলে রাজনীতির বিরাজনীতিকরণ ঘটছে। শিক্ষিত জুম্মদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনা ও সক্রিয়তা অপসৃত হচ্ছে। আগামী দশ বছর পরে জুম্মদের ভাগ্য তাহলে কি ঘটবে? ততদিনে পাহাড়ের হাজার হাজার একর জমি সেটেলার, সামরিক-বেসামরিক আমলা, সরকারি-বেসরকারি তৎপরতায় বেদখল হয়ে যাবে। ততদিনে আরো শতাধিক জুম্ম জনপদে হামলা, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, খুনের ঘটনা ঘটবে। তখনো কি পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিওরা "Victimized, Merginalized ethnic entity life support/reservation Project"-এর নামে Doner-এর কাছে সাহায্য চেয়ে খয়রাতি করবে? ততদিনে আমরা অবশ্য খয়রাতিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবো। সেদিন কি JSS/UPDF/ JSS (MN LARMA) থাকবে নাকি ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? সেদিন কি আমরা থাকবো নাকি বিলুপ্ত হয়ে যাবো? হয়তো সেদিনও আমরা বিলুপ্ত হওয়া ঠেকাতে কোন Project Paper লিখে Doner এর কাছে FUND চাইবো!?

* লেখাটি আমাদের ব্লগ সাইটে প্রকাশিত, www.chtbd.org

প্রান্তিক স্বর দ্যোতনায় উপনিবেশিক বিদ্রোহ

রুদ্র শায়ক

"জীবন শেষ হয় চিহ্নহীন বিন্দুতে, পথ শেষহীন, পথের
চিহ্ন থাকে, তৈরী হয় নতুন ঘর, নতুন জানালা"
-মঈন চৌধুরী
প্রবন্ধ সংগ্রহ পৃ-২১১

ভাষার মধ্যে আমরা শুধু জন্মই নি নাই। আমরা শাসিত ও অত্যাচারিত হয়েছি। সংগ্রাম করেছি ভাষাকেন্দ্রিক দমন নিপীড়ন থেকে মানবিক শুভবোধকে বাহির করতে। একই ভাষার ভেতর অবস্থান করেও স্বাধিকারের প্রয়াস থাকে আরো অনেক স্বরের ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে যা সামাজিক সাংস্কৃতিক লড়াই।

যথাযোগ্য মর্মোপলব্ধি করলেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করা সম্ভব হয়। অনুভূতির প্রাক বৌদ্ধিক ও আদিম স্তরে (Pre-Rationaland Primative level of feeling) প্রয়োগবাদী উইলিয়াম জেমস বলেছেন- I am against bigness and greatness in all their forms. কোন সামাজিক সংগঠন যতই বৃহত্তম হতে থাকে ততই তা হয়ে পড়ে আরও শূন্যগর্ভ এবং প্রায়শই যেন তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিকে নির্মম নিষ্পেষনের যন্ত্র। সমতলির কবিতার একঘেয়েমির মাঝে পাহাড়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কবিতা প্রচল প্রথায় অপ্রচল বৌদ্ধিক শৃংখল নিয়ে নিজস্ব স্বরদ্যেতনায় তৈরি করেছে কাব্য প্যারাডাইম, যা সমকালীন বহুরৈখিক বীক্ষণের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করে আলোকিত করেছে কবিতা মণ্ডপের অর্চনা প্রক্রিয়া।

কেবল সাহসী স্বাধীন, ইচ্ছাশক্তিতে সমৃদ্ধ, আত্মশক্তিতে মান বীরোচিত মনোভাবাপন্নরাই এক্ষেত্রে একাকী সফল হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থ পূরণ করতে গিয়েও কোন ব্যক্তি তার সাংগঠনিক, গোষ্ঠী কিংবা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষত একান্ত স্বার্থকে প্রায়ই উপেক্ষা করে। এমনই বিরল কোন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হয়তো তার জাতীয়তাবাদী কিংবা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব নিয়ে নিজের কাব্যজ্ঞান ভাণ্ডারকে খুলে দিবে, যে প্রয়াস প্রচেষ্টা পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষণীয়। তাদের নানা ধরনের প্রকাশনার মধ্যেও সাহিত্যের অবস্থান দৃঢ়। যা উপনিবেশ উত্তর সময়ের চলমান গতিকে করেছে সমৃদ্ধ–
"AS Interest grows more disciplined and Concentrated thought becomes more vigorous and more definitely Proposive"

Stadies in Huamnism Pa- 12
F.C.S Sechiller.

মানুষই হলো কেবল তার বাস্তব সত্তার নির্মাতা। বাস্তব সত্তা জ্ঞেয় হলেই কেবল এর স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু কবি নির্মাণ করে স্বপ্ন যে সেই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। যার দৃষ্টিনন্দন চোখ এগিয়ে থাকে সময়ের কুহক থেকে। কারণ মানবসত্তা বা জীবন নিজেই এক মহা স্বপ্নের নাম, বাংলাদেশ নামক ব-দ্বীপের ভূ-সংস্কৃতি একরৈখিক নয়। নানা ধর্ম-বর্ণ ও জাতির সংমিশ্রণে বিন্যাসিত বহুরৈখিক সংস্কৃতি। পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই বয়েছে অসংহতি (inconsistency) তাই সংশ্লেষণিক বিকৃতি (Synthetic Statement) সম্ভব নয়। কারণ প্রভেদকে উপলব্ধি করা যায়। একীভূত করা যায় না। তাই আত্মবিষয়ীগতা (Intersubjectivity) চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক যোগাযোগ সম্ভব। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তার সামাজিক মাত্রা থাকবে হয়তো, ব্যবহার যোগ্যতা অনেকখানি হারাবে। পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষা সংস্কৃতি, জীবনবোধ স্বকীয়তা খুব ধীর গতিতে পাল্টে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় চাতালে। খোদ পাহাড়েই তাদের যাপিত জীবন শৃঙ্খল ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করে চিহ্নিত করার বিষয়টি নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণার পাঠক্রম হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় ভাষার সাংগঠনিক হেজেমনিতে হারাচ্ছে তাদের ভাষা-বর্ণ। ভাষা লালন সংগ্রহ ও চর্চাই হয়ে উঠছে বিরল। কেন্দ্রীয় ভাষার অর্থনৈতিক মূল্য ও শিক্ষা মাধ্যমের মূল উপজীব্য হওয়াই এর অন্যতম কারণ। বৈষয়িক জীবন তাদের বাধ্য করছে কিংবা তারা সময়ের নিপুণ শিকার হয়ে পাল্টে যাচ্ছে কিংবা বদলে দিচ্ছে ভূ-সংস্কৃতির ডিসকোর্সগুলো।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রবণতাই বেহাত করেছে উত্তর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য। বহু স্তরায়িত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস কাঠামো।

সময় আজ নিজেই নিজের হন্তারক। জ্ঞানকাণ্ডের শাখায় চোখ খুললেই দেখি সময় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছে? ক্ষুদে মীমাংসা নয়তো সহজ বিকল্প প্রস্থান। নিজস্ব জগতের অযাচিত অভেদকে ভেদ করে চাইছে মুক্তি। সামাজিক মানববোধ ও আজ দাঁড়িয়ে নেই আগের জায়গায়। গতি ও ভাবনার ক্ষেত্র হচ্ছে দ্রুততর। চলার পথের সেই স্বর দ্যোতনা আজ কবিতা। খণ্ডতা চিরদিন ছিল, আছে, থাকবে কিন্তু গতির দায় সেই ভাঙ্গনকে পেরিয়ে যাওয়া। সমকালীন সমাজ ভাবনায় এখন বিভিন্ন জাতিসত্তার ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কৃতির পরিচয় মূল্যায়ণ পাচ্ছে। একই সাথে ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের দ্বার খুলে দিয়েছে মননশীল বিশ্ববীক্ষা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার পাজর খুলে কেন্দ্রের সাথে প্রান্তের সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপন করছে। যার স্বরূপ সন্ধানই উপজীব্য। কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক গ্রামীণ কাঠামো লোক-সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক স্বর পরিপুষ্টি লাভ করছে বৈশ্বিক সময় চেতনায়। একই সাথে মহানাগরিক জীবনে সংঘাত তৈরি হচ্ছে মফস্বলীয় শৈশব ও নাগরিক যৌবনের টানাপড়েনে। স্মৃতি-বিস্মৃতি, মূল্যবোধ আর ঐতিহ্যের বোঝাপড়ার টানাপড়েনই সময়ের জটিলতায় টিকে থাকার ন্যূনতম মূল্যবোধের জাংজারি রাখে মনন চেতনায়। যুগ্ম বৈপরীত্যে নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রকৌশল।

প্রান্তিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কবিতাকর্মীরা যদি কবিতায় একটি নতুন সময় ও ভাষার সৃষ্টি করতে পারে, তাহলেই সমকালীন বহুরৈখিক সামাজিক বিন্যাস স্তরে নিজেদের অংশিদারীত্বকে প্রমাণ করে জাতি ও রাষ্ট্রে স্বকীয় ভূ-সংস্কৃতি রক্ষায় অবদান রাখতে পারবে। এরই সাথে রুখতে পারবে আগ্রাসী প্রলোভনকে।

প্রতিটি দ্যোতনাই সাময়িক ও আপেক্ষিক। চিন্তাসূত্র বা পারিভাষিক পাঠকৃতির মধ্যে দিয়ে অর্জিত দ্যোতনা আরো পরিশীলিত হয়ে থাকে। আবার ঐ পুনঃপরীক্ষিত ও পুনর্জিত দ্যোতনা একই প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। এই নিরবচ্ছিন্ন পরিপূরণের আয়োজন অর্থের ধারণাকে আমূল পাল্টে দেয়, দিচ্ছে। তা কেবল বৌদ্ধিক জগত নয়। আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক পরিসরেও ঘটে চলছে অহরহ। জ্ঞেয় দ্যোতনা অভিজ্ঞানকে উপস্থিতি ও আত্মউপস্থিতির নিরিখে বিচার করে। এসব আত্মউপস্থিতি সর্বদা আগে থেকেই পার্থক্যবোধের দ্বারা বিচূর্ণিত। মিথ্যার প্রগলভ নির্মিতি আধিপত্যবাদী বর্গের দাম্ভিক চাতুর্যে যত অবারিত হোক না কেন আজ, প্রান্তিক ও ব্রাত্যজনই হয়ে উঠছে যথার্থ প্রগতির আয়ুধ। উপনিবেশিক মনন শামিয়ানার নিচে কোথাও যেন দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্ব নেই। আমাদের ভেতরও নেই বাহিরও নেই। যা আছে তা কেবল অনবরত পরিবর্তন। জ্ঞানের অহংকার করতে আমরা অভ্যস্ত। অথচ কোন সত্তাকে কখনো জানি না, এমনকি নিজেকেও নয়। সমস্ত অস্তিত্ব কেবল অস্তিত্বের পাঠকৃতি ভাবকল্পের গোলক ধাঁধা হয়ে থাকবে? না, নিশ্চয় তা নয়– Framework of differences এ ধারণার সাহায্যে নিরবচ্ছিন্ন তাৎপর্যপুঞ্জ তৈরি করে কোন বায়বীয় অবস্থান নেওয়া সম্ভব হয় না। নিরন্তন আত্মজিজ্ঞাসায় প্রায়োগিক অভিব্যক্তি গ্রহণ করাই সবচেয়ে জরুরি। একই সাথে কেন্দ্রমুখী পিঞ্জরকে শনাক্ত করে যুক্তির পথ রচনা করতে হবে। যে পথ অনন্ত কেবল ব্যাপক উদ্যামে শুরু করাই প্রত্যয়। কেউ কেউ পথচিহ্ন আঁকতে আঁকতে হারিয়ে যাবে, কেউ হবে বিচ্যুত আবার বারবার ব্যাপক উদ্যামে সংযোগ ঘটাবে প্রতিস্পর্ধার সাহসী তরুণরা।

আপাতত বয়ানে সরলতা থাকলেও কেন্দ্রীয় ভাষায় এ প্রান্তবাসী তরুণ আগ্রাসী প্রলোভনে বিচলিত, অক্ষম আক্রোশে খুন হয় নিজের বোধ জাগরণের মননরেখায়। ভিতরে যূথবদ্ধ হবার তাড়না অনুভব করেন। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ নিজের অস্তিত্ব জানান দেবার তাড়নায় মরণ কামড় দেয়। এমনই এক দৃশ্যকল্প অঙ্কিত হচ্ছে তার মেজাজের মোজেদায়।

'এই হচ্ছে আমার সবুজ পাহাড়ের জীবন
যেখানে পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়
কল্লার মত শত নারীর আত্মচিৎকার'
আমার সবুজ পাহাড়॥ '

-জুয়েল চাকমা
জুম-২০০৯।

সবুজ পাহাড়ে হিংসার ঝর্না ধারা বহে যায়, উপনিবেশিক মানসিকতার বীজ মননে নিয়েই। কেন্দ্রীয় জনগণ সাদা চামড়া কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হওয়ার একই সাথে ক্রোধ

অন্যদিকে প্রভূত্বের সাদা চামড়ার প্রতি লোভ এই ধরনের অযাচিত বোধ গিলে খাচ্ছে যার বিকৃত প্রয়োগ পাহাড়ি নারীদের ধর্ষণ। যা মানবিক সভ্যতার বিবেককে করছে প্রশ্নবিদ্ধ।

"হৃদয়ের যাবতীয় ক্ষয় ক্ষতি আর ক্ষত
যদি সেরে যায় অকৃপণ তোমায় সেবায়"

-সংক্রান্তি॥ মংসিংঞো
জুম-২০০৯

ক্ষত তো শুকিয়ে যায় খুব বেশি দেরিতে হলেও। দাগ রয়ে যায় দেহে। শুধু কারো কারো আচরণ মনে পড়ে যায়। এই সব ক্ষত সেরে গেলে সেই সব আচরণ ভুলে স্বদেশ সেবায় মনোনিবেশ করতে অবিচল প্রত্যয়দীপ্ত এ কবি।

"ফিরে আসে পর্দা জরুরি অবস্থায়
আর একবার এই পথ দিয়ে হেঁটে যাব
রঙ থেকে রঙচটা হয়ে যাবার আগেই"

দৃষ্টি সরে না। প্রানজি বসাক
-সমুজ্জ্বল সুবাতাস- ২০১১।

নিম পাখির ডাক পাহাড়িয়া সরল জীবনের মিথ যা পাখির ডাক শুভ লক্ষণের। হলুদিয়া নিম পাখির ডাকের ভেতর দিয়ে কবি বিপন্ন জনপদে শান্তির বার্তা বয়ে দিতে চান।

"আমার দীর্ঘশ্বাসের কারণ জানে জয়নিতা
যে কালকেও আমার সাথে স্বর্গ তোরণে উঠতে রাজি ছিল না,
আজকে সে আমার হাত ধরে পেরোচ্ছে ভয়ের মুমূর্ষু অসুখ"
-শরনার্থীকালে। আলোড়ন খীসা, হুচ- ২০১৩

নিপীড়িত জাতিসত্তার প্রতিটি হৃদয়ই ওয়াকিবহাল তার দীর্ঘশ্বাসের সমীকরণ নিয়ে। তবুও পাশাপাশি ভালোবাসাবাসি তো আর চাইলেই হয় না। মানুষ তবুও যুদ্ধের মাঠে, অযাচিত রণভূমে সবভুলে হাত ধরে লড়তে, রক্ষা করতে, বাঁচতে বাঁচাতে চায় নিজের ভূমিটুকু। উপনিবেশ শেষ হওয়া আর উপনিবেশোত্তর চেতানার বিকাশ এক নয়। চিন্তার ক্ষেত্রে বৈকল্য ও বিশৃঙ্খলা ব্যাপক। বণিক স্বার্থের একক-কেন্দ্র বহুমুখী স্বার্থের মধ্যে তলিয়ে গেছি। তবু এ গ্যাঁড়াকল থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে নিতে হবে প্রান্তবাসী নৃ-গোষ্ঠীকে। বৃত্ত পরিধির মধ্যেই জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। সনাতন জীবন আর মহানাগরিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় করে জ্ঞানতাত্ত্বিক জীবনে সম্পর্কায়িত করা যায় এবং করতে হবে। জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয় বটে কিন্তু জ্ঞানের বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিতে হয়। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, জীব জগতকে বিচ্ছিন্ন করে, সাহিত্যে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে আঁকা অনৈতিক।

মানুষের আছে নানাবিধ ফন্দি-ফিকির, আবরণ প্রতিভা, তার আশ্রয় প্রকরণ অনন্য। কেবল বাস্তুভিটা নয়, আছে অসংখ্য কোটর, অনেক আড়াল রচনা, ভাষা এমনই এক

মাথা গোঁজার ঠাঁই, সেই ঠাঁই যেন নিশ্চিত হয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন বিন্যাসে। তাই একই সাথে প্রয়োজন ভাষার অর্থকারী অনিবার্যতা ও সাহিত্যের সুবিপুল রত্নভাণ্ডার। যা রচনা করতে হবে প্রান্তভাষি নৃ-গোষ্ঠীকেই, নিজস্ব ভাষায়, জাত্য অভিমানে। বাকে প্রচলিত শব্দ সম্পর্কে ভেঙে দিয়ে এক পৃথক কাব্যিক প্যারাডাইম রচনা করতে হবে। যেন আবরণের পরিচিত সমাজতাত্ত্বিক শর্ত ফাঁস হয়ে যায়।

জেমস্ জর্নেশ চিরান-এর কবিতা

উপর্যপুরি ধর্ষণ

এখোনো ভিনদেশী হানাদার আসে
পাথরের অজুহাতে পাহাড় কাটে
উদ্যানের অজুহাতে নিষ্ঠুর করাত চালায়
লালিত প্রাচীন বৃক্ষে
আদিবাসী কবিতার সতীত্ব থাকে না।

বড়ো দয়াহীন শ্রাবণী আকাশ
অনবরত বৃষ্টিতে ধ্বসে পড়লো পাহাড়
আমার নৃ-জাতীয় চেহারা পাল্টে গেলো
'ইকোপার্ক' বা পর্যটন শিল্প যাতনায়
নগরীর শিল্প সেবায় তার এতো উপর্যপুরি
অনবরত ধর্ষণ
বর্ণনাতীত অসভ্যতা।

পাহাড়ী শ্রাবন্তী নায়িকা মরেও মরতে পারে না
আদালতে মামলা দেয় না নিষ্ঠুর নারী নির্যাতনের
এগিয়ে আসে না জনপ্রিয় মানবাধিকার
সংস্থার প্রধান।

হিমেল রিছিল-এর কবিতা

কবি ও কষ্টের নদী

(শ্রদ্ধেয় কবি মতেন্দ্র মানখিন-এর *'হৃদয় বৃত্তান্ত এক কষ্টের নদী'* কবিতাটি পড়ে)

এ কেমন একটা অশুভ অসময়ে আবির্ভাব কবি আমাদের?
হৃদয়বৃন্তে কষ্টের নদী থেমে থাকে
সেখানে স্রোত নেই, স্বপ্ন নেই, সঙ্গীত নেই
সাড়া নেই, শব্দ নেই, পারস্পরিক বোঝাপড়া নেই।

বাঁকা চোখ, বাঁকা মুখ, বাঁকা অঙ্গভঙ্গি কি
বুঝে ব্যথিত কবির শ্রমসাধ্য কবিতার ভাষা?
বুঝে কি কবির নষ্ট দিনের কষ্ট অহর্নিশ?
বুঝে না। বুঝে না তারা শব্দশ্রমিক কবি কিংবা কবিতার কী মূল্য!

হাজারো কষ্টের গান গেয়ে বার্ধক্যে এসে দাঁড়ালেও
লিখে চলেছেন অগণিত নতুন কবিতা, বঞ্চিত মানুষের কথা
হাজারো হাজারিকা হয়ে আপনি আমাদের শুনিয়ে যাবেন
বৈষম্যবিহীন নতুন শতাব্দীর মানবতার গান।

বর্ণমালা পরিচয়

স্বপ্নে আমি প্রায়ই তোমাকে সাজাই
স্বরবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে
স্বরে-আ, হ্রস্ব-ই, এ অথবা ঔ
বর্ণে বর্ণে সাজানো অল্প কথার বউ।

তুমি বলো- অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে
আমার এই প্রাণখানি যখন জুড়ালে
ঘোষ-অঘোষ বর্ণমালা দিয়ে আমায় যখন বশ-ই করে রাখলে
তবে সবকটা স্পর্শধ্বনিই তোমাকে দিলাম
আমার জন্য শুধু শিস্ ধ্বনিটুকু রাখলাম
অন্তস্থ বর্ণগুলো থাকুক আমাদের দু'জনের মাঝখানে।

আমি বলি- কাল আবার এসো
চন্দ্রবিন্দুর চাঁদ কিংবা বর্গীও জ-এর জোছনা
সব তোলা রইল কেবল তোমার জন্য।

স্বাস্থ্যবান কবিতা

একটি স্বাস্থ্যবান কবিতা প্রজননে
বিশুদ্ধ জল জীবন চাই
শুদ্ধতম উচ্চারণে প্রেমিকার সাহচর্য চাই
শুদ্ধ শব্দাবলীর সতত সমাগম চাই।

কবিতা পাঠ চাই, তার পাঠোদ্ধার চাই
স্বপ্ন চাই, কল্পনা চাই, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতি চাই
সুখ ও দুঃখের এক বিন্দুতে মিলন হওয়া চাই
শ্রম-সাধনা-সময়ের যথেষ্ট সৃষ্টি চাই।

দাবি-দাওয়ার যদি সাধপূরণ ঘটে, যদি শুদ্ধ পরিশোধিত হয়
তবে এই নাও একটি স্বাস্থ্যবান কবিতা।

পাহাড়ি সংস্কৃতির ভাঙা সেতু

অজল দেওয়ান

নাম দেখে অনেকে হয়তো ভিরমি খেতে পারেন। যারা সাহিত্য বা রাজনীতির সাথে অল্পবিস্তর যুক্ত তাদের কাছে নামটি পরিচিত ঠেকতে পারে। তাদের অনুমানই সত্যি, নামটি নিয়েছি আমার প্রিয় সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে। তাঁর প্রবন্ধটি বাম রাজনীতি বা যারা সর্বহারা রাজনীতির সাথে যুক্ত তাদের একটি আবশ্যিক পাঠ্যবিষয়। কারণ, **সর্বহারা সংস্কৃতি বা কৃষক-মজুরদের সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার সাথে একজন মধ্যবিত্তীয় তরুণ যার চোখে মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, শিকল ভাঙার গান, তার একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ সর্বহারাদের সাথে একাত্ম হওয়ার একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন ইলিয়াস**। মধ্যবিত্ত পরিবারে সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে বড় হওয়া একজন তরুণের সর্বহারা সংস্কৃতির সাথে মধ্যবিত্তীয় সংস্কৃতির এক যোগসূত্র এই বইয়ের সারমর্ম। আমি আবার নতুন করে সে বিষয়টি অবলোকন করতে চাচ্ছি না। আমি বরং তাঁর এই প্রবন্ধের কিছু আইডিয়া বা concept কে কাজে লাগিয়ে পাহাড়ি জনগণের উপর প্রয়োগের কিছু বৃথা চেষ্টা করেছি মাত্র। ইলিয়াসের মত সাহিত্যিক বা চিন্তাশীল লেখক হওয়ার মত চিন্তা দুঃস্বপ্নেও আসে না। তবে, তাঁর চিন্তার সূত্র আমাদের নিজেদের জীবন-সংস্কৃতির উপর প্রয়োগের কিছু বৃথা চেষ্টা করলে অবশ্য কেউ কিছু মনে করবেন না।

বাংলাদেশে প্রায় ৪৫ টির উপর আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। পাহাড়েই রয়েছে প্রায় ১১ টির মতো। এদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরারা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর চেয়ে একটু বেশি। অতীতে এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভাল একটা সদ্ভাব দেখা গেলেও বর্তমানে তার রেশ একটু কম। এর পিছনে কি রয়েছে আসুন একটু পর্যালোচনা করে আসি।

রাঙ্গামাটির তুলনায় খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে মারমাদের সংখ্যা একটু বেশি। আগে চাকমা আর মারমাদের মধ্যে ভাল একটা সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে এটা যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। চাকমারা পারতপক্ষে চায় না মারমাদের উন্নতি আর মারমারাও চাকমাদের নিয়ে এতটা উচ্ছ্বসিত নয়। পারস্পারিক অবিশ্বাসদের দেয়াল আস্তে আস্তে করে ভাগ করে দিয়েছে এই দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। চুক্তিপূর্ব সময়ে শান্তিবাহিনী এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদে একটা

সময়ে চাকমা এবং মারমা ছাত্রদের বিশাল অংশগ্রহণ ছিল। এসব সংগঠনে চাকমাদের প্রভাব ছিল বেশি এবং নেতৃত্বপর্যায়েও ছিল চাকমারা। মারমারা চাকমাদের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে ছিল তাই তারা শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের উন্নত করার চেষ্টা করতেই চাকমাদের মধ্যে কিছুটা মনক্ষুণ্নতার প্রভাব দেখা যায়। কারণ, তারা মনে করত যে, PCP বা জেএসএস করার মাধ্যমে তারা তো শুধুমাত্র চাকমা নয়, বরং পাহাড়ের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছে। তারা মারমাদের এই প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে না দেখার কারণে মারমাদের মধ্যেও আস্তে করে এই বিদ্বেষের বীজ বপণ হয়ে যায়। তারাও মনে করতে শুরু করে যে, চাকমারা কারো উন্নতি দেখতে পারে না। তারা মনে করে, মারমারা নিজেদের উন্নতি করতে পারলে তারা ধীরে ধীরে চাকমাদের স্থান দখল করতে পারে এই ভয় চাকমাদের মধ্যে কাজ করে। এভাবে শুরু হয়ে যায় পারস্পরিক অবিশ্বাস।

ত্রিপুরারাও প্রায় একইভাবে নিজেদের আলাদা ভাবতে শুরু করেছে। তারা মনে করে নিজেরা যদি নিজেদের প্রয়োজনীয় স্বার্থকে কাজে লাগিয়ে জাতির একটু সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে তবে তা দোষের কোন ব্যাপার নয়। ফলে তারাও আজ নিজেদের বিবেচনা করছে পাহাড় মায়ের এক বৈমাত্রেয় সন্তান হিসেবে।

বর্তমানে মারমারা নিজেদের গড়া মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল এবং ত্রিপুরারা ত্রিপুরা ছাত্র সংসদ, তন্‌চঙ্যারা করে তন্‌চঙ্যা সংসদ আর চাকমারা তাদের নিজস্ব নাম দিয়ে তৈরিকৃত কিছু ভূঁইফোড় সমিতি বা জায়গাভেদে ছাত্র সংগঠন করে। এদের মধ্যে যারা একটু ভাল রাজনীতি বোঝে বা করতে চায় তারা PCP করে। আবার বর্তমানে জাতীয় রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করার প্রবণতা খুব প্রবল মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। অনেকে বামপন্থী রাজনীতি করার মাধ্যমে স্বীয় জাতি তথা সমগ্র শোষিতশ্রেণির মুক্তি চাইছে আবার অনেকে বর্তমান বুর্জোয়া দলগুলোর সাথে যুক্ততার মাধ্যমে কিছুটা ক্ষমতার স্বাদ পেতে চাইছে। অন্যদিকে, বর্তমান প্রজন্মের বিশাল একটা অংশ রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করার মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন করার মধ্য দিয়ে নিজেদের কয়েকজনের মাঝে একতা রাখার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে vacation-এর সময় তারা পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গরীব পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান করার মাধ্যমে সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে। সাংস্কৃতিক মানের ক্ষেত্রে প্রায় একই দৃশ্য। কয়েকজন মিলে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন করার মাধ্যমে 'বিদেশী' বা নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা করার একটা প্রবণতা ইদানিং লক্ষ্য করা যায়। পুঁজিবাদী সমাজে অবস্থান করার কারণে একদিকে যেমন ভোগবাদী প্রবণতা তুঙ্গে উঠেছে এর বিপরীত দিকে ক্রমশ রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়নের ফলে নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠেছে জাতীয় এক চেতনাবোধ। এই চেতনাবোধ শুধুমাত্র স্বীয় জাতির প্রতি, পাশাপাশি কেউ নিপীড়িত হচ্ছে কিনা তা দেখার সময় পাওয়া যায় না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সময় না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ভোগবাদী প্রবণতা ও জাতীয় চেতনাবোধের গ্যাঁড়াকলে আজ সমগ্র পাহাড়ের বর্তমান প্রজন্ম। প্রজন্মের মধ্যে একদিকে

জ্ঞানপঙ্গুত্বের ও অপরদিকে নবসৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তারা চাইছে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য, নতুন কিছু করে দেখানোর আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখে। রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়ন তাদেরকে ভাবতে বাধ্য করছে ভিন্ন কিছু করার আবার সম্ভাবনাকে অনেকে ভোগের বিলাসে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সকলেই তাদের নিজস্ব আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার নিয়ে মনোকষ্টে ভোগে।

ফলে, কোন আঘাত আসলেই আমরা নিজেদের জুম্ম জুম্ম বলে সেই আঘাতকে প্রতিরোধ করতে চাই। কিন্তু, এই জুম্ম শব্দটাও এখন অনেকটা চাকমারা নিজেদের করে নিয়েছে। পাহাড়ের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে যারা বাইরে পড়াশোনা করে তারা এই ধারণা পোষণ করে যে, জুম্ম শব্দটা এখন শুধুমাত্র চাকমাদের জন্য। সেখানে মারমা, ত্রিপুরা, চাক, তন্চঙ্যাদের স্থান নেই। কেন, এই ধারণা? পাহাড়ি শব্দের মধ্যেও আবার বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করে পাহাড়ি শব্দটার মাঝে একটু backwardness এর গন্ধ আছে। জুম্ম শব্দটাও দিন দিন পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাচ্ছে। আবার আদিবাসী হিসেবে পরিচয়ের চেয়ে পাহাড়িটাই অনেকে বেশি প্রাধান্য দেয়। তাহলে কি আমরা দেশের এই অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তাসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করবো? নাকি আমরা চাইব আগে থেকে প্রচলিত বা হয়ে আসা নাম পাহাড়ি বা জুম্ম এই নামেই পরিচিত হতে?

আমি পাহাড়ের অধিবাসীদের এখনো পাহাড়ি হিসেবেই সম্বোধন করি এবং বাকি অংশেও এই নামেই আমি উল্লেখ করব।

পাহাড়িরা এখনো অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই। পাহাড়িরা হয় একেবারে মধ্যবিত্ত যারা চাকরি করে বা নিজেদের জায়গা-জমি বা বাগানবাড়ি আছে অথবা হয় একেবারে সর্বহারা। এরা অন্যের জমি চাষ করার মাধ্যমে উপার্জন করে নিজের ও ছেলেমেয়ে-বৌকে খাওয়ায়। মোট কথা, পাহাড়িদের মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণি বা পুঁজিপতির চেহারা এখনো দেখা যায় নি। তাছাড়াও, আমরা আমাদের অর্থনীতিকে এক অনির্ণেয়ক স্থানে রেখে দিয়েছি। আমরা যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে খাজনা দেয়ার মাধ্যমে দেশের সমগ্র পুঁজিব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি আবার দেখা যায় যে, আমাদের সামন্তীয় প্রভু যেমন চাকমা রাজা, মারমা রাজা, বোমাং রাজাদের খাজনা দেয়ার মাধ্যমে তাঁদের রাজত্বও স্বীকার করে নিচ্ছি। সামগ্রিক দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে আমরা পুঁজিবাদের একটা পর্যায়েই আছি। পাহাড়ি মধ্যবিত্তরা পুঁজিবাদের শোষণে নিষ্পেষিত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের জীবন সংগ্রাম চালান। পাহাড়ের পরিবারগুলোতে মধ্যবিত্তীয় কালচার প্র্যাকটিস করা হয়। শিক্ষিত পরিবারগুলোতে গান-নাচও শেখানো হয়।

মধ্যবিত্তীয় মা-বাবারা জন্মের পরপরই সন্তানদের এই শিক্ষা দেন যে, নিজেকে পরিবেশ বা সিস্টেমের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য। এরপর সে বড় হওয়ার পর আশেপাশের পরিবেশে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের ফলে আস্তে আস্তে করে ভাগ করতে শুরু করে পাহাড়ি-বাঙালি এই ধারণা। যতই সে বড় হতে থাকে ততই সে তার নিজ সমগোষ্ঠীয় বন্ধুদের সাথে একাত্ম হতে থাকে। খুব অল্প সংখ্যক চাকমা ছেলে আছে যাদের

একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারমা বা ত্রিপুরা। মারমা বা ত্রিপুরাদের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সত্যি। আমরা কেউ এর ব্যতিক্রম নই। কেন এই ভাগ-বিভাজন? কেন এই জাতিসত্তাগত বিরাগ?

ইলিয়াস যেমন বাংলাদেশের মধ্যবিত্তীয়শ্রেণির সাথে সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়েছেন একই পার্থক্য এই ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। সমজাতিসত্তা বন্ধুর সাথে আমরা যে সংস্কৃতি-ঐতিহ্য দিয়ে মিশে একাত্ম হতে পারি অন্য জাতিসত্তাসমূহের বন্ধুদের সাথে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। দু'টি জাতির মাঝে এমন কোন সংস্কৃতি এখনো পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি যা দুই জাতিকেই একই ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে। তাছাড়াও, তেমন কোন আদর্শও এখানে কাজ করে না। কারণ, আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে এক করে দিতে পারে। তাই, এখানেই আসে সংস্কৃতির পার্থক্যের রূপ।

পাহাড়ের প্রতিটি জাতির নিজস্ব আচার, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আছে। আমি নিজেও চাকমা ছেলে বিধায় চাকমা গান, চাকমা কবিতা বা চাকমা ফিল্ম দেখার একটা প্রবণতা আছে। কিন্তু, আমার মধ্যে কেন মারমা গান বা কবিতার প্রতি সেই অনুরাগ পোষণ করি না? অনেকে হয়তো বলতে পারেন ভাষাগত দূরত্বের কারণে শোনা, দেখা হয় না। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, গ্যাংনাম স্টাইল গানের প্রতিটি লাইন কয়জন বোঝে একমাত্র কোরিয়ান বাদে? নিজের যদি সদিচ্ছা থাকে তবে ভাষাগত দূরত্ব কোন বিষয় হতে পারে না। যেখানে, আমরা হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটা ভিনদেশের ভাষাকে রপ্ত করার প্রাণপণ চেষ্টায় রত থাকি সেখানে পার্শ্ববর্তী পাড়ার এক চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ভাষাকে কেন সেই ভিনদেশীয় ভাষার মত রপ্ত করার চেষ্টা করি না?

চাকমা ছেলে মেয়েরা যখন একত্রিত হয় তখন সেখানে চাকমা ভাষাসহ চাকমা গানের প্রাধান্য থাকে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানে একজন মারমা বা ত্রিপুরা ছেলে কি স্বাভাবিক বোধ করবে? তখন সে অবশ্যই তার সাংস্কৃতিক দূরত্বভাব পোষণ করতে বাধ্য। তখন তার মাঝে জাত্যভিমাণী কাজ করে। নিজেকে হারিয়ে সে খুঁজতে চায় কিন্তু তার দিশা না পেয়ে সে তার সমগোষ্ঠীয় বন্ধুদের খোঁজে এবং সেখানে তার সাংস্কৃতিক চর্চাটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে।

আজকাল ছেলে-মেয়েরা হিন্দি থেকে শুরু করে ইংরেজি গান, ফিল্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তারা সেটা বুঝুক আর নাই বুঝুক। তারা ওইগুলোকে standard হিসেবে ধরে নিয়ে নিজেদেরকে সেইভাবে উপস্থাপন করতে চায়। এটাকে আমরা বলব 'অপসংস্কৃতির প্রভাব'। সেই সাথে জাতিগত নিষ্পেষণের কারণেই হোক আর জাতির প্রতি টানের কারণেই হোক তারা নিজেদের সংস্কৃতিরও চর্চা করে। কিন্তু, পাশাপাশি অন্য জাতিসমূহ যারাও রাষ্ট্র কর্তৃক নিপীড়িত তাদের সংস্কৃতিকে জানার বা চর্চা করার প্রবণতা অনুপস্থিত কারণ সেখান থেকে শেখার বা চর্চার কোন সুযোগ নেই। যেখানে হিন্দি ভাষাকে জানার মাধ্যমে তাদের গান বা সংস্কৃতিকে ধারণ করার একটা প্রবণতা থাকে সেখানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা গানের ক্ষেত্রে তা নেই।

মারমাদের সংস্কৃতির মধ্যে এটা সবার জানা সেটা হল পানি খেলা। কিন্তু এর পিছনের ইতিহাস কি সবার জানা আছে? তাদের সংস্কৃতি যে লোকগীতিতে সমৃদ্ধ সেটা আমরা কতজন খেয়াল রাখি? অথচ যার যার সংস্কৃতির প্রতি আমাদের অনুরাগ প্রচণ্ড। চাকমাদেরও এমন কিছু আচার-সংস্কৃতি আছে যা মারমা বা ত্রিপুরারা কি জানে? এভাবেই সাংস্কৃতিক দূরত্বের মাধ্যমে আস্তে আস্তে শুরু হয় স্বজাতিকেন্দ্রিকতা যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দূরত্ব সৃষ্টি করে।

কোন একটি রাজনৈতিক দলের মাঝে যখন পাশাপাশি দুই সহকর্মী বা নেতা-কর্মীর মাঝে বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে যায় তখন সেখানে আসে ভাঙন, আসে বিভক্তি। অনেক সময় সেটা আদর্শিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। পুরোনো জেএসএস ভেঙে নতুন জেএসএস (এম. এন লারমা) এর উত্থানের পিছনে যেটি কাজ করেছে সেটি হলো আদর্শিক। যখনই দলের মধ্যে বিশ্বাস ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে গেল তখনই আস্তে আস্তে করে মারমারা সরে যেতে থাকে PCP থেকে। এখন খুব কম সংখ্যক মারমা এবং ত্রিপুরা ছেলে PCP করে। তারা বর্তমানে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন রকম সামাজিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থাকতে পছন্দ করে। তারা মনে করে এভাবে ক্রমাগত নিজেদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারলে সেটা আখেরে তাদের এবং স্বীয় জাতির উন্নতি সাধিত হবে।

ক্ষমতায়নের দিকে যদি একটু দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাবো যে, বর্তমানে চাকমারা ক্রমশ নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে ফিরছে। খাগড়াছড়ির কথাই ধরা যাক, এখানকার এমপি, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ত্রিপুরা হওয়াটা চাকমা আর মারমাদের জন্য একটু মন কুটকুট করার বিষয়। কিন্তু, তারা এটা দেখে না এই এমপি, চেয়ারম্যানরা জাতিস্বার্থের চেয়ে শ্রেণিস্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দেন। তাদের কাছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা সবাই সমান। হয়তো দেখা যাবে যে এই আমলারা তাদের জ্ঞাতিভাই বা আত্মীয়কে দুর্নীতির মাধ্যমে কোন চাকরি বা কাজ পেতে সাহায্য করছে এবং এটিকেই তখন বিবেচনা করা হচ্ছে তার জাতিভাইদের সে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ধারণ করা ভুল। কারণ, আমলা ত্রিপুরা বলে সে সমগ্র ত্রিপুরা জাতিসত্তার জন্য কাজ করছে না তার কিছু আত্মীয় বাদে। তাই, জাতিগত বিরাগভাজন থেকে এটিকে বিচার না করে শ্রেণিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত।

এবার আসি রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে। রাজনৈতিক দল বলতে আগে পাহাড়ে একটিমাত্র সংগঠন ছিল সেটি জনসংহতি সমিতি। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য এই দলের নেতারা তাঁদের যৌবন, সংসার বিসর্জন দিয়ে দেশের আগ্রাসী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন এতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতই যদিও চাকমাদের সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর ভাগের মত। এরপর আস্তে আস্তে করে ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে এই দলের কার্যক্রম। দলীয় কোন্দলের ফলে নিহত হন

এম.এন লারমা, এরপর এক পর্যায়ে চাবাই মগও নিহত হন অজ্ঞাতনামাদের হাতে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চাকমা ও মারমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তারা একে একে দল ত্যাগ করতে থাকে। পরবর্তীতে '৮৯ সালে এসে প্রতিষ্ঠিত হয় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এবং এদের সরাসরি রাজপথে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে অধিকার আদায়ের আন্দালন আরো বেগবান হয়। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয় ধীরে ধীরে। সরকার তার অবস্থান থেকে সরে এসে বাধ্য হয় পার্বত্য চুক্তি করতে। এরপর তো ইউপিডিএফ-এর সৃষ্টি, যারা চেয়েছিলো স্বায়ত্তশাসন। তারা চুক্তি বিরোধীতার মাধ্যমে বর্তমান পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এখন চুক্তি বিষয়ে তাদের অবস্থান নমনীয় পর্যায়ে। আরো একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন আছে, তবে সেখানে সাংস্কৃতিক অঙ্গসংগঠন অনুপস্থিত। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলোর সাংস্কৃতিক মান, চর্চা কিভাবে বিকশিত হচ্ছে সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে। তারা পাহাড়ের প্রতিটি মানুষের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য এবং একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে অথচ, সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে দলগুলো পড়ে আছে ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতার জায়গায়। একটি আদর্শকে সামনে রেখে লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ বাধা সৃষ্টি করছে বারবার। এভাবে, সামগ্রিক অর্থে তারা সকল জাতিসত্তাকে এক সূত্রে গাঁথতে ব্যর্থ হয়েছে।

একটা সময়ে যে জেএসএস ও ইউপিডিএফ এ সবার অংশগ্রহণ ছিল আজ কেন সেই দলগুলোতে শুনতে হচ্ছে চাকমাদের দল বলে? মারমা ও ত্রিপুরারা কেন এই দলগুলোর সাথে নিজেদের একাত্মতা পোষণ করতে পারে না? এটা কি তাদের দোষ? নাকি দলগুলোর কার্যক্রমই পরিণত করেছে তাদের এই মত পোষণ করতে? আমার এক বড় ভাই একবার বলেছিলেন, খাগড়াছড়ির পানখাইয়া পাড়ায় নাকি ইউপিডিএফ তার কার্যক্রম চালাতেই পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে, পানখাইয়া পাড়া হচ্ছে মারমা অধ্যুষিত পাড়া। তারা উভয় দলকেই বিবেচনা করে চাকমাদের দল বলে। রাজনৈতিক দলগুলো এটা নিয়ে কোনদিন চিন্তা করেছে কী? কেন তাদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ দেয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তর তারা খুঁজে দেখেছেন কিনা আমার আদৌ জানা নেই। মারমা, ত্রিপুরাসহ আরো প্রায় ৮টি জাতির অবস্থান পাহাড়ে। এই ১০টি জাতির চিন্তা-চেতনা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দিয়ে বিকশিত না হওয়ার কারণই এক্ষেত্রে প্রধান। এছাড়াও, রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ক্রমাগত বিবাদ-সংঘাত এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রতিটি জাতিরই উচিত তার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি, আচার-ঐতিহ্যের পাশাপাশি শিক্ষা-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়া। এর সাথে সাথে পাহাড়ের সকল জাতিসত্তার মধ্যে সাংস্কৃতিক একটা মেলবন্ধন ঘটানো। এমন কিছু আমরা কি করতে পেরেছি? নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা ছাড়া আর কিছুই করা হয়ে ওঠে নি। দেশের মধ্যবিত্তীয় জীবনব্যবস্থার সাথে পাহাড়িরাও আজ গা ভাসিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং তা ধীরে ধীরে ব্যক্তিবিচ্ছিন্নতাবোধে পরিণত হওয়া মানবিক ক্ষয়িষ্ণুতা আমাদের গ্রাস করেছে। একটা প্রবাদ আছে যে, পাহাড়িরা নিজেদের ভালো নিজেরা সহ্য করতে পারে না। এটি এমনি এমনি তো আসে নি। সাংস্কৃতির দূরত্বের প্রভাব শেষ পর্যন্ত পাহাড়িদের নিয়ে যাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

সবশেষে রাষ্ট্রের কথাই বলবো। রাষ্ট্র কর্তৃক দমন-পীড়ন তো সেই স্বাধীনতার আগ থেকে লেগে আছেই, নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে, এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, ১৯৮৯ সালের জেলা পরিষদ নির্বাচন হয় এবং যখন সারা দেশের জেলা পরিষদগুলো বাতিল করা হয় শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাগুলো বাদে, সেই নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ সরকার চাকমাদের সাথে অন্যান্য জাতিসত্তাগুলোর মাঝে বিভাজন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়, যদিও সেই নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল জেএসএস। জেলা পরিষদগুলোতে আসন সংখ্যা চাকমারা কম পায় এবং চাকমারা অন্যান্য জাতিসত্তার চেয়ে শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে এগিয়ে ছিল তাই এই ঘটনার ফলে অন্যান্য জাতি যারা একটু পিছিয়ে ছিল তাদেরকে সরকার কাছে টানতে সক্ষম হয়। এভাবে, রাষ্ট্র ধীরে ধীরে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে থাকে। আগে একটা সময় ছিল যখন এরশাদ ক্ষমতায় তখন পাহাড়িদের মধ্যে যারা মেট্রিক বা ইন্টার পাশ করত তাদেরকে খুঁজে খুঁজে চাকরি দেয়া হত। এভাবেই ক্রমাগত সরকারের দাসানুদাস করার মাধ্যমে পাহাড়িদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে স্তিমিত করতে চাইল সরকার। ফলে, পাহাড়ি সমাজে সৃষ্টি হয়ে গেল বিশাল এক মধ্যবিত্তশ্রেণি, যারা সকালে উঠে অফিসে যায় আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত কুটিলতা ছাড়া এদের আর কিছু নেই। এরা পুঁজিবাদী সমাজে অবস্থান করেও সামন্তীয় চিন্তাধারায় এখনো প্রভাবিত এবং প্রগতিশীলতার কোন ছাপ এদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়াও, এর প্রভাবে পাহাড়ি পুঁজিও তেমন সৃষ্টি হতে পারেনি। পাহাড়িদের অর্থনীতিও আজো পড়ে আছে অনেক পিছনে।

পাহাড়িদের অধিকার আদায়ের পথ কখনো মসৃণ ছিল না। না ছিল সেটা চুক্তিপূর্ব সময়ে না বর্তমানে সময়েও। এখনো আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। রাজনৈতিকভাবে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সবার আগে প্রয়োজন পাহাড়ের সমস্ত জাতিসত্তার মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি করা। মারমাদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন, BMSC অথবা প্রমাসাস যারা নিজেদের সামাজিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাবি করে তাদেরকে সহ আরো বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য একটা কমন প্ল্যাটফরম গঠন করা খুবই জরুরি। PCP-কে হয়তো এই কমন প্ল্যাটফরম হিসেবে গ্রহণ করার একটা সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই সকল রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনগুলোর উচিত নিজেদের কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজ করার মাধ্যমে পাহাড়ের ১১টি জাতিসত্তাসহ দেশের ৪৫টি আদিবাসী জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক এক মেলবন্ধন তৈরির উদ্যোগ নেয়া।

ঘুণে ধরা জুম্ম আদিবাসী সমাজের কিছু কথা

এডিসন চাকমা

য়েল য়েল আমা দেজ মোন-মুড়োগুন,
য়েল য়েল আমা দেজ ঝারানি,
রাঙা রাঙা মানজোর মনানি//
বঙ্গানুবাদঃ
সবুজ সবুজ আমাদের দেশের পাহাড়-পর্বত,
সবুজ সবুজ আমাদের দেশের বন,
রাঙা রাঙা মানুষের মন//

জনপ্রিয় এই চাকমা গানের মতই নির্ভেজাল আর সুন্দর ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষগুলোর মন। গেংহুলি গীতের মতই সরল ছিল মানুষের জীবন-যাপন। কিন্তু আজ সেই মনে ধরেছে পচন। চারদিকে ভোগবাদী চেতনা আর রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক আগ্রাসনে জুম্ম আদিবাসী সমাজের মধ্যে ধরেছে ভয়াবহ পচন। এই পচন রোধ করবে কে?

১৯০৮ সালে শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ 'চাকমা জাতি : ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত' বইয়ে লেখেন, 'কিন্তু কেন জানি না, চাকমাদিগের চরিত্রে সংযমের একান্ত অভাব। অতি সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। স্কুলছাত্রদের মধ্যেও দেখিয়াছি, চাকমা বালকের অনেকে হইত অংক কষিতেছে, কিন্তু প্রথম চেষ্টা বিফল হইতেই "ন পারিম" বলিয়া ফেলিয়া রাখিল। বোধহয় সংযমেরই অভাবে চাকমাদিগের মধ্যে মিতব্যয়ীতা একেবারেই নাই। নতুবা ইহারা যেরূপ পরিশ্রমী এবং উপার্জনক্ষম, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা ইহাদিগকে অতি সামান্যই আঘাত করে, তাহারা উপস্থিত সুখ-সম্ভোগে নিতান্ত ব্যগ্র হয়। শিক্ষিতদের মধ্যে কেহ কেহ সাক্ষাত বিলাতফেরত বাবু, চলা ফিরাও অনেকটা ইঙ্গবঙ্গদলসম্মত। ইহা ছাড়া, সাধারণ চাকমাদিগের মধ্যেও এতদূর বিলাস ইচ্ছা প্রবেশ করিয়াছে যে, কেহ কেহ দোকানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে "রাজা যে কাপড় পরেন" সেই পোষাক অনুসন্ধান করে।' তিনি যদি সকল জুম্মদের নিয়ে লিখতেন তাহলে অবশ্যই এই মন্তব্যটি সকল জুম্ম আদিবাসীদের জন্যই করতেন। শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯০৮ সালে যেই কথাটি অনুধাবন করেছেন সেই কথাটি আমরা আজও অনুধাবন করতে পারিনি। তাইতো ভোগবাদী চেতনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে আমরা ভুলতে বসেছি অধিকার কি জিনিস, কীভাবে অধিকার আদায় করতে হয়।

এই ভোগবাদী চেতনা আগে এত পরিমাণে প্রকট ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র খুব সূক্ষ্ম কৌশলে এই চেতনাকে কাজে লাগিয়ে উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে গোটা জুম্ম আদিবাসী

সমাজকে করেছে অধিকার সম্পর্কে অসচেতন, আন্দোলন বিমুখ, ভোগবাদী আর জুম্ম যুব সমাজকে করেছে ট্রেন্ডি, ফ্যাশনেবল, নেশা ও জুয়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আর জুম্ম রমণীরা স্টার প্লাস, স্টার জলসার সিরিয়াল বোঝে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত ১৩টি গণহত্যার কথা বোঝে না, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ত্যুমাচিং মারমা, ক্লাশ ফোরের ছাত্রী সুজাতা চাকমাকে যখন ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয় তখন তাদের আত্মচিৎকার জুম্ম রমণীদের হৃদয় স্পর্শ করে না। 'কিন্তু এখনও তাহারা ইহা শিখিতে মনোযোগ দিচ্ছে না। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অত্র রাঙ্গামাটি গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়ের তদানীন্তন হেডমাস্টার বর্তমানে পেনশনপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রামকমল দাস মহোদয় এই স্কুলের শাখা স্বরূপে গভর্নমেন্ট ব্যয়ে কুম্ভকার, কর্মকার ও সূত্রধর নিযুক্ত করিয়া একটি শিল্পবিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের ঔদাসীন্যে অচিরে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। হায়! তাহা এতদিন জীবিত থাকিলে অনেক শুভফল প্রদান করতো। জাতীয় নেতৃবর্গের এই ত্রুটির নিমিত্ত সমাজকে আরও বহুকাল কষ্ট পাইতে হইবে (তথ্যসূত্রঃ চাকমা জাতি : ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত)।' শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ ১৯০৮ সালে মন্তব্য করে গিয়েছিলেন বহুকাল এই ত্রুটির ফল ভোগ করতে হবে। সেই ফল যে শত বছরেও শেষ হবে না, তা যদি তিনি অনুমান করতে পারতেন তাহলে পুরো জুম্ম জাতিকে মাথায় গোবর ভরা বলদ ছাড়া অন্য কিছু মন্তব্য করতেন বলে আমার মনে হয় না। জুম্মদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে দা, বটি ইত্যাদি অন্যতম। অথচ আমাদেরকে আজও বাঙালিদের দ্বারস্থ হতে হয় এই সব সামগ্রী ক্রয় করার জন্য। যে জাতি অন্য জাতির মুখাপেক্ষী, নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থাহীন সেই জাতি পৃথিবীতে বেশিদিন টিকতে পারে না। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জুম্ম আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে অনেকগুলো এনজিও, তাদের মধ্যেও জুম্ম কামার, কুমার তৈরির ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তাছাড়া, জুম্মদের মধ্যে যারা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও আর্থিকভাবে সচ্ছল তাদের মধ্যেও তেমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না এই সমস্যাটির ব্যাপারে চিন্তা করতে। না জানি, সাধারণ জুম্মদেরকে আরো কতবছর সেই আগেরকার বিত্তবানদের করা ভুলের মাশুল গুনতে হবে! এরশাদ সরকারের সময় তিনি শিক্ষিত জুম্ম আদিবাসীদেরকে চাকরি নামক এক বাঁধনে আবদ্ধ করেছিলেন, যাতে এই শিক্ষিত শ্রেণি শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে না পারে, যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নামে সুবিধাবাদী একটি শ্রেণি তৈরি হয়। তিনি অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষিত জুম্মদেরকে চাকরির বন্ধনে যত বেশি পরিমাণে আবদ্ধ করা যাবে তত বেশি পরিমাণে ভোগবাদীতা এদের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি না পারে সইতে আর না পারে আন্দোলন, প্রতিবাদ করতে। এরা সবসময় চেষ্টা করে ঝামেলা এড়িয়ে চলার। অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটাকেও এই শ্রেণি মনে করে ঝামেলার অংশ। এরশাদের আমলে সেই শুরু হয়েছিলো যা আজো প্রবাহমান। বর্তমান শিক্ষিত জুম্ম আদিবাসী শ্রেণি এখন দৌড়াচ্ছে চাকরি নামক সোনার হরিণের পিছে। শিক্ষকতা পেশা একটি মহান ও সম্মানীয় পেশা। এম. এন. লারমা পার্বত্য

চট্টগ্রামে বিপ্লব শুরু করেছিলেন প্রথমে শিক্ষকতা পেশা দিয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জুম্মরা যদি শিক্ষিত না হয় তাহলে চিরদিনই অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থেকে যাবে; আর গতানুগতিক শিক্ষার দ্বারা সেই সচেতনতা কোনদিনই আসবে না। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো জ্বালানোর উদ্দেশ্যে হাতে তুলে নিয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তারের মশাল। এম. এন. লারমা ও তার সহচরদের হাতে শিক্ষা পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা হয়েছিল অধিকার সম্পর্কে সচেতন, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন শান্তিবাহিনীতে। তাইতো এম. এন. লারমার হাত ধরে শুরু হওয়া সেই বিপ্লবের অন্য আর একটা নাম হয়ে গিয়েছিল টিচার্স রেভ্যুলেশন বা শিক্ষক বিপ্লব। কিন্তু বর্তমানে জুম্মদের কাছে শিক্ষকতা আর পেশা নয়, অন্য দশটা চাকরির মত একটা চাকরি। বর্তমান জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যার ভবিষ্যত লক্ষ্য শিক্ষক হওয়া। তার বদলে তাদের লক্ষ্য থাকে কীভাবে ডাক্তার হব, কীভাবে ইঞ্জিনিয়ার হব, কীভাবে উপজাতি কোটায় কোটাবন্দি হয়ে বিসিএস ক্যাডার হব, কীভাবে দুই হাতে টাকা কামাব, গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্সের মালিক হব। তারপরেও জুম্মদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু কারা করছেন? একটাই উত্তর : যারা অন্য চাকরি জুটাতে পারেন নি তারাই শিক্ষকতা করছেন। এখন বি. এ., এম. এ. পাশ করা জুম্মদের লক্ষ্যই থাকে কীভাবে ফুড অফিসে চাকরি পাব, কীভাবে ডিসি অফিসে চাকরি পাব, কীভাবে ব্যাংকের ম্যানেজারের পদটি বাগিয়ে নেব এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা। কারণ, এইসব চাকরিতে ঘুষ আছে যে! শিক্ষকতা পেশায় তো ঘুষ নেই, বেতন কম। কিন্তু কেউ আর বুঝার চেষ্টা করেনা শিক্ষকতার মত মহান ও সম্মানের পেশা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমার আশেপাশের অনেকজনকেই দেখেছি যারা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের চাকরি পাওয়ার পরে দুর্গম এলাকায় স্কুল হওয়ার কারণে ঠিকমত স্কুলে যান না। তার বদলে সেভেন-এইট পাশ কাউকে মাসিক কিছু টাকার বিনিময়ে শিক্ষকতার চাকরি বর্গা দিয়ে দেন। অথচ সকাল হলেই নমঃ নমঃ সন্ধ্যা হলে নমঃ নমঃ। স্কুলে ঠিকমত না পড়িয়ে মাস শেষে বসে বসে বেতন তোলাটা তাদের কাছে পাপ বলে মনে হয় না, নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করে দুর্নীতি করে মাস শেষে বেতন তোলাটা তাদের কাছে অপরাধ বলে মনে হয় না। এরা দুর্নীতির মাধ্যমে আয় করা পাপের টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে, ধর্মের প্রলেপ দিয়ে দুর্নীতিটাকে হালাল করার জন্য। আর তাদের দেখে লোকজনও বাহবা দেয়, আহ! কত বড় ধার্মিক! এদের এই ধরনের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় দুর্নীতির মাধ্যমে আয় করা পাপের টাকাকে জায়েজ করার জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘুষ দিচ্ছে। অথচ এদের দায়িত্ব হল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে তৈরি করা। শিক্ষকতার মত মহান পেশার সাথে জড়িতদেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সেই জাতি উন্নত হবে কীভাবে? মানুষগুলো অধিকার সচেতনই বা হবে কীভাবে? এইসব শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীগুলোও কোনদিনই সুশিক্ষা পাবে না, শিক্ষার নামে যা পাবে তা হল সার্টিফেকেট সর্বস্ব শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞান

অর্জন, আর শিক্ষকের কাজ একজন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা। কিন্তু বর্তমানে জুম্ম আদিবাসীদের কাছে শিক্ষার অর্থ হল মোটা মোটা নাম্বার যোগে কিছু সার্টিফিকেট যোগাড় করা যাতে পরবর্তীতে মোটা বেতনের একটা চাকরি যোগাড় করা যায়। শিক্ষকদের কাজও যেন, জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা নয়, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবই মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিতে সাহায্য করা। জ্ঞানার্জন নয়, সার্টিফিকেট অর্জনই এখন মূল কথা। বর্তমান জুম্ম আদিবাসী সমাজের কাছে হাজার হাজার বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করা একজনের চেয়ে শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়ে সার্টিফিকেট অর্জন করা একজন বলদের মূল্য অনেক বেশি। তাই সবাই ছুটছে রেসের ঘোড়ার মত, চাকরি নামক সোনার হরিণের পিছনে। যে কোন আন্দোলনের সাথেই অর্থ নামক শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুধুমাত্র আবেগ আর প্রেম দিয়ে কোন আন্দোলন সফলতা পেতে পারে না। আপনি সশস্ত্র বিপ্লব বা রাজপথের আন্দোলন যেই পথেই হাঁটেন না কেন সেই আন্দোলন বিফলে যেতে পারে শুধুমাত্র পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে। ভারত, মায়ানমার, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান যেই দেশই আপনাকে সাহায্য করুক না কেন নিঃস্বার্থভাবে কেউই আপনাকে সাহায্য করবে না। অর্থ, অস্ত্র যা দিয়েই সাহায্য করুক না কেন, আপনি পরিণত হবেন তাদের ক্রীড়নকে, করতে হবে তাদের স্বার্থের বাস্তবায়ন। তখন আপনার আন্দোলন চলবে তাদের আঙুলের ইশারায়। আপনাকে বাঁয়ে হেলতে বললে বাঁয়ে হেলতে হবে আর ডানে হেলতে বললে ডানে হেলতে হবে। কিন্তু আপনার যদি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকে তখন আপনার সাহায্যকারী বন্ধুর যেমন অভাব হবে না, তেমনি অস্ত্রেরও অভাব হবে না। সেই জন্য প্রয়োজন জুম্মদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা। অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য প্রয়োজন চাকরির পাশাপাশি জুম্ম ব্যবসায়ী শ্রেণি সৃষ্টি করা। জুম্মদের মধ্য থেকে যে সব ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। বর্তমান শিক্ষিত শ্রেণি ব্যবসার কথা বললে, বলে পুঁজি নেই। আমরা স্কুল-কলেজে পড়ে আসা শিক্ষাকে জীবনে কাজে লাগাই না, আর সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষিত হওয়ার কারণে ভুলে যাই, 'ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল'। আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম, বিএ পাশ করে বেকার বসে আছিস কেন? ব্যবসায় নেমে পর। যদি পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি থাকে তো সেই পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসায় নেমে পর। প্রয়োজনে মরিচের ব্যবসা শুরু কর। আমার সেই বন্ধুটি উত্তর দিয়েছিল, বিএ পাশ করেছি কি মরিচ ব্যবসা করার জন্য? আমরা এক লাফে গাছে উঠতে চাই, যার কারণে ব্যবসার প্রতি আমাদের এই মানসিকতা। তোমার যদি পাঁচশ টাকা পুঁজি থাকে তাহলে সেই পাঁচশ টাকা দিয়ে ব্যবসায় নেমে পর। এমন একটা ব্যবসা খুঁজে বের কর যেই ব্যবসাটা পাঁচশ টাকা দিয়েও শুরু করা যায়, আস্তে আস্তে বড় হতে দোষ কোথায়? বর্তমানে বাংলাদেশের যত বড় বড় শিল্পপতি রয়েছেন তাদের সবাই শূন্য থেকে আস্তে আস্তে আকাশ ছুঁয়েছেন। চোখের সামনেই রয়েছে এমন অনেক উদাহরণ। স্কয়ার গ্রুপের মালিক প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরী ঔষধের ব্যবসা শুরু করেছিলেন মাত্র

কয়েক হাজার টাকা দিয়ে, অথচ আজ তার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। আবুল খায়ের গ্রুপের মালিক বিড়ি বানিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন, অথচ আজ তার নামে শাহ সিমেন্ট, আবুল খায়ের স্টিলসহ অনেকগুলো ব্যবসা। আজাদ প্রোডাক্টের মালিক তার ব্যবসা শুরু করেছিলেন মাত্র আট টাকা দিয়ে। মোল্লা সল্ট, ক্রাউন সিমেন্টের মালিক খবিরউদ্দিন মোল্লা তার ব্যবসা শুরু করেছিলেন কাগজের ঠোঙা বানিয়ে। বিআরবি ক্যাবল ও কিয়াম মেটালের মালিক মজনু মিঞা তার ব্যবসা শুরু করেছিলেন একটা ভাঙারির দোকান থেকে। আকিজ গ্রুপের মালিক তার ব্যবসা শুরুর প্রথম দিকে হাত দিয়ে বিড়ি বানিয়ে বিক্রি করতেন, অথচ আজ আকিজ ফুড, আকিজ সিমেন্টসহ অনেকগুলো ব্যবসার মালিক। এমন আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে চোখের সামনে, তবুও কেন পুঁজি নিয়ে চিন্তা? পার্বত্য চট্টগ্রামের সেটেলার বাঙালিরা একটা মাত্র বালিশ আর ছেঁড়া কম্বল নিয়ে এসেছিল, অথচ ব্যবসা করে আজ তাদের অনেকেই কোটিপতি। তাহলে আমরা জুম্ম আদিবাসীরা এই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিজ সন্তান হয়েও কেন ব্যবসা করে সুফল পাবো না? এর উত্তর খুঁজে নিতে হবে আমাদেরকেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে রয়েছে অপার প্রাকৃতিক সম্পদ। বাঁশ, কাঠের যেই ব্যবসাটা রয়েছে সেই ব্যবসাটাও ঠিকমত ধরতে পারিনি আমরা। জঙ্গল থেকে বাঘ-ভালুকের আক্রমণ, সাপ-মশার কামড় উপেক্ষা করে বাঁশ, কাঠ কেটে নিয়ে এসে যেই লোকটি বিক্রি করছে সে একজন জুম্ম। কেটে নিয়ে এসে বিক্রি করা সেই জুম্মটির কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে অপর একজন মধ্যসত্ত্বভোগী জুম্ম আদিবাসী ব্যবসায়ী; তারপর সেই ব্যবসায়ীটি বিক্রি করছে একজন বাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে; আর সেই বাঙালি ব্যবসায়ীটি কম দামে কিনে ঢাকা, চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে সেটেলার বাঙালিরা। আর জুম্ম ব্যবসায়ীদেরকে মধ্যসত্ত্বভোগী ব্যবসায়ী হয়েই তুষ্ট থাকতে হয়েছে সব সময়। শুধুমাত্র বাঁশ-কাঠের ব্যবসায় নয়, ঝাড়ু, কাঁঠাল, আনারস, আদা, হলুদের ব্যবসার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রজোয্য। এখন প্রশ্ন হল সেটেলার বাঙালিরা পারলে আমরা কেন পারছি না? কারণ হল ব্যবসার প্রতি জুম্মদের মানসিকতা, সেটেলারদের প্রতি রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক ভূমিকা আর জুম্ম আদিবাসীদের চাকরির পেছনে দৌড়ানো। যেই সব মধ্যসত্ত্বভোগী জুম্ম ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত; ফলে ঢাকা বা চট্টগ্রামে গিয়ে ব্যবসা করাটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঢাকা বা চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী শ্রেণি সংখ্যাগুরু বাঙালি সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার কারণে জুম্ম ব্যবসায়ীদের ঢাকা বা চট্টগ্রামে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঙালি বন্ধু-বান্ধব না থাকার কারণে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না পার্বত্য চট্টগ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকা বা চট্টগ্রামে গিয়ে ব্যবসা করা। অন্যদিকে জুম্ম সমাজের মধ্যে বিয়ের বাজারে চাকরিওয়ালা জামাইদের কদর বেশি হওয়ার কারণে শিক্ষিত যুব সমাজের লক্ষ্যই থাকে মোটা বেতনের একটা চাকরি যোগাড় করা। তাছাড়া ব্যবসা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকা আর সার্টিফিকেটের যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দমত ব্যবসায় নেমে পরার মত পুঁজির অভাবেও

শিক্ষিত জুম্মদের মধ্য থেকে ব্যবসায়ী তৈরি হচ্ছে না। অথচ হাঁস-মুরগির খামার, গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগলের খামার ইত্যাদির মাধ্যমেও জুম্ম ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরি হতে পারত। কিন্তু জুম্মরা লেখাপড়া শিখে মানুষ না হয়ে ফুলবাবু হওয়ার কারণে ব্যবসা করার মত শিক্ষিত জুম্ম আদিবাসী ব্যবসায়ী শ্রেণি তৈরি হচ্ছে না।

চলতি ম্যাগাজিনের সম্পাদক সাহেব আমাকে বার বার বলেছিলেন আমি যেন ধর্মের বিষয়ে না লিখি, কারণ এটি খুবই স্পর্শকাতর ইস্যু। কিন্তু আমাকে যে লিখতেই হবে, হতে হবে সত্যের মুখোমুখি। কারণ ঘুণে ধরা জুম্ম আদিবাসী সমাজের কথা বলতে গেলে ধর্মের কথাটিও আসবে অবধারিতভাবেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম আদিবাসীদের বেশিরভাগই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের কথাটিই আসবে প্রথমে। বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো ধর্ম আছে তার মধ্যে অন্যতম নিরীহ আর শান্তির ধর্ম হল বৌদ্ধ ধর্ম। যদিও বৌদ্ধ দর্শন আর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে অনেক তফাৎ। অনেকের মতে বুদ্ধ কোন ধর্ম প্রচার করেননি, তিনি দর্শন প্রচার করেছিলেন যা পরবর্তীতে ধর্মে রূপান্তর করা হয়। বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধ মূর্তির পূজা, আত্মা ইত্যাদি অলৌকিক বিষয়কে অস্বীকার করা হয়েছে। আর ধর্ম অনেক অলৌকিক ব্যাপারে সমর্থন দান করে। বৌদ্ধ দর্শন মতে বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত চারটি–

১. ঈশ্বরকে অস্বীকার করা; অন্যথায় 'মানুষ স্বয়ং নিজের প্রভু'– এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়।

২. আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা, অন্যথায় নিত্য একরস মানলে তার পরিশুদ্ধি এবং মুক্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৩. কোনো গ্রন্থকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হিসেবে স্বীকার না করা, অন্যথায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

৪. জীবনপ্রবাহকে এই শরীরের মধ্যেই সীমিত মনে করা, অন্যথায় জীবন এবং তার নানা বৈচিত্র কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন না হয়ে স্রেফ এক আকস্মিক ঘটনা রূপে প্রতিভাত হবে (তথ্যসূত্র : বৌদ্ধ দর্শন)।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র হল, 'অহিংসা পরম ধর্ম'। নিয়ম-নীতির মধ্যে রয়েছে প্রাণী হত্যা মহাপাপ, প্রাণী ব্যবসা করা মহাপাপ। কেউ যদি তোমার এক গালে চড় লাগায় তাহলে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করবে না, প্রয়োজনে অন্য গালটিও এগিয়ে দাও চড় মারার জন্য। ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতায় সিদ্ধার্থ গৌতম নিজে জিতলে দেবদত্তের সাথে শত্রুতা বাড়বে বলে তিনি দেবদত্তকে জিতিয়ে দিয়ে নিজে হেরে যান। শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, একমাত্র মৈত্রীতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম সম্ভব। সহিংস হয়ো না, মৈত্রীভাব পোষণ কর এমন শিক্ষায় পাচ্ছি সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনী থেকে। তাই আমরাও হব অহিংসার এক একজন মূর্ত প্রতীক; সেটেলার বাঙালিরা জবাই করলেও বলব- মৈত্রী, মৈত্রী, মৈত্রী। সেটেলাররা বাড়ি সুদ্ধ পুরো পাড়াটি জ্বালিয়ে দিলেও বলব- মৈত্রী, মৈত্রী, মৈত্রী। আশা করে

থাকব সেটেলাররা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি অবশ্যই পাবে। ইহজনমে না হলেও পরজন্মে অবশ্যই পাবে। আর আমাদের এরূপ মানসিকতা দেখে শাসকগোষ্ঠী হাততালি দেয়, বলে, সাব্বাস জুম্ম জনতা; এই মৈত্রীভাবটাকে ধরে রাখ, আরো বেশি বেশি মৈত্রীভাব পোষণ কর, যাতে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে আমার বেশি বেগ পেতে না হয়। মুসলিম শাসক ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বকতিয়ার খলজি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন বৌদ্ধ ধর্মানুসারীরা সেই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেনি আর বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বুদ্ধ মূর্তির সামনে ছিল ধ্যানে মগ্ন। যার ফলে ইখ্‌তিয়ারের কোন সমস্যা হয়নি শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষুর শিরচ্ছেদ করতে। পরবর্তীতে যারা বেঁচে ছিল তারা বাধ্য হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আর বাকিরা মিশে যায় হিন্দু ধর্মের সাথে (তথ্যসূত্র : ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান আর পতন)।

পার্বত্য চট্টগ্রামেও জুম্ম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এমন কোন মূহুর্ত ধেয়ে আসছে না তো? মৈত্রী নিয়ে পরে থাকা বৌদ্ধ ধর্মানুসারী জুম্মদের কাছে প্রশ্নটি তোলা রইল। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী কিছু কিছু জুম্মদের মধ্যে মৈত্রীভাব এতই প্রবল যে, এরা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক মশাটিও পর্যন্ত মারে না। এমন মৈত্রীভাব পোষণকারী একজনের কাছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ আশা করাটা নিশ্চয় বোকামির পরিচায়। যখন কেউ তোমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তোমার বোনটিকে ধর্ষণ করছে তখনও এমন মৈত্রী নিয়ে পরে থাকা নপুংসকতার পরিচয় ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আরো অনেক আগে ব্রিটিশদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারত; পারেনি একমাত্র অহিংসার মুখোশধারী মহাত্মা গান্ধীর কারণে। তিনি ছিলেন সুবিধাবাদী, ব্রিটিশদের সোল এজেন্ট। যখন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিপ্লবীদের হাতে ব্রিটিশরা মার খেতে খেতে পর্যুদস্ত ঠিক তখনই অহিংসার বাণী নিয়ে আবির্ভাব ঘটে মহাত্মা গান্ধীর। যার কারণে আন্দোলনে পরে ভাটা, হয়ে যায় স্তিমিত। গান্ধী ব্রিটিশদের এজেন্ট ছিলেন বলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূর্যসন্তান নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরামের মত বীর সেনানীদের আখ্যায়িত করেছিলেন সন্ত্রাসী হিসেবে। পরে জনগণ আস্তে আস্তে ফুঁসে উঠছে দেখে ব্রিটিশরা তড়িঘড়ি করে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় আর গান্ধীও হয়ে ওঠেন অহিংস আন্দোলনের এক অন্য নাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পেছনে গান্ধীর অহিংস আন্দোলন নয়, মূল কারণ ছিল জনগণের মনে দানা বাধা অনেক দিনের ক্ষোভ (তথ্যসূত্র : গান্ধীজির অপকর্ম)। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিকে কট্টরপন্থী মুসলিম জনগোষ্ঠীর উত্থান আর অন্যদিকে বন ভান্তে, নন্দপাল ভান্তে, উছালা ভান্তে ইত্যাদি ভান্তের সংস্পর্শে এসে জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রীময় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার। ফলে জুম্ম আদিবাসীরা আন্দোলন, সংগ্রামের দিকে না ঝুঁকে, বেশি ঝুঁকছে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করার দিকে। এতে লাভ হচ্ছে কতটুকু তা আমাদেরকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

বর্তমান চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় একবার বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকতে পারে কিন্তু যা আছে সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশ্বের উন্নত শহরগুলোর

মত শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি এলাকায় পরিণত করতে বেশি দিন সময় লাগবে না।' হ্যাঁ, আমরা যদি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি তাহলে অবশ্যই বেশি দিন সময় লাগবে না পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি এলাকায় পরিণত করতে। ফলজ বাগান, ঔষধি গাছের বাগান, শাক-সবজির ক্ষেত করতে হবে। কোন জমি যেন পতিত না থাকে সেই দিকে নজর দিতে হবে। যেই জমিতে যা উপযোগী তা চাষ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে পাহাড়, বন রয়েছে সেখানে ঘাসের যথেষ্ট প্রাচুর্যতা রয়েছে। ঘাসের এই প্রাচুর্যতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা গরু, ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা করেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের চেহারা পাল্টিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এখানেও বাদ সেধেছে বৌদ্ধ ধর্ম। ভান্তেরা বলছেন, প্রাণী ব্যবসা মহাপাপ। ধর্ম বাঁচলে জাত বাঁচবে। তাই আমরা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি পালন করব না। প্লিজ, ধর্মকে অন্য পাশে সরিয়ে রাখুন। ধর্ম বাঁচলে কখনোই জাত বাঁচে না, জাত বাঁচলেই না তবে ধর্ম পালন করার মানুষ থাকবে। আর জাতই যদি না বাঁচে তাহলে ধর্মটা পালন করবে কে? ভারতে প্রবল পরাক্রমে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বৌদ্ধ ধর্মের দীপ আজ কেন নিভু নিভু সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদের। তা নাহলে জুম্ম জাতির ধ্বংস অনিবার্য। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই আমাদেরকে এগুলো করতে হবে।

আজ অবধি জুম্মদের মাঝে তেমন কোন উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী সৃষ্টি হয় নি। জুম্মদের মাঝে উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীরা দাঁতের মাজনের গণ্ডি আজ অব্দি পেরোতে পারেনি। ব্যবসায় নামার আগে দেখি কোন ব্যবসাটা বর্তমান বাজারে চলছে বেশি; যাচাই বাচাই করে আমরা সেই ব্যবসায় ঝাপ মারি। নিজের মেধা আর বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা নতুন কোন ব্যবসা উদ্ভাবন করতে পারি না; তাই উদ্যোক্তা সৃষ্টি থেকে যায় অধরাই। আগে এদেশের কেউ চিন্তাও করেনি পানি বিক্রি হতে পারে। অথচ মিনারেল ওয়াটারের বোতল আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী। আগে এদেশের কেউ চিন্তাও করেনি মানুষের চুলের বিকিকিনি হতে পারে। অথচ আজ চুল দিয়ে পরচুলা তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আগে এদেশের কেউ চিন্তাও করেনি দেখলেই গা ঘিনঘিন করা কেঁচোর ব্যবসা হতে পারে। অথচ আজ কেঁচোর ব্যবসা করে খুলনার একজন কেঁচো চাষী লাখ টাকার মালিক। আগে এদেশের কেউ চিন্তাও করেনি কচু লতি বিদেশে রপ্তানি করে কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। অথচ এখন প্রতি বছর বিদেশে কচু লতি রপ্তানি করে কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। আগে এদেশের কেউ চিন্তাও করেনি রান্নার পরে ফেলে দেওয়া ছাই বিক্রি হতে পারে। অথচ আজ ঢাকায় গ্রামীণ ছাইয়ের প্যাকেট কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। তাহলে আমাদের জুম্মদের মধ্যে কেন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে না? চিন্তাও করুন, মাথাটাকে কাজে লাগান। এমন একটা ব্যবসা উদ্ভাবন করুন যা বাজারে চলবে ভাল অথচ আজ অব্দি সেই ব্যবসাতে কেউ হাত দেয়নি। বন্যপ্রাণী সংরক্ষন আইনের একটি বিধিতে হরিণের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের বিধি মোতাবেক চলে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়ে হরিণের খামার স্থাপন করা যায় কিনা যাচাই করে

দেখুন। সেমে আলু (কাসাভা) দিয়ে অন্য কোন কিছু প্রস্তুত করা যায় কিনা ভাবুন। শুকরের মাংস প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যায় কিনা যাচাই করুন। প্রতি বছর সংরক্ষণাগারের অভাবে প্রচুর পরিমাণে আম, কাঁঠাল, আনারস নষ্ট হয়ে যায়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি সংরক্ষণাগার স্থাপন করার কথা বিবেচনা করুন। পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী আর ছরাগুলি হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। তাই এইসব খরস্রোতা ছরায় ছোট আকারের হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট বসানোর কথা চিন্তা করুন। মোটকথা উদ্যোগ নিন, উদ্দ্যোক্তা হোন। অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া আন্দোলন যেমন গতি পাবে না, তেমনি সাহায্যকারী শক্তির বলয় থেকে বেড়িয়ে আসাও সম্ভব হবে না। আমরা জুম্মরা চারদিকে অনেক অনুপ্রেরণার গল্প শুনি, পড়ি আর অনুপ্রাণিতও হই কিন্তু সেই অনুপ্রেরণার গল্পগুলি বাস্তব জীবনে কাজে না লাগাই না ফলে ব্যবসাতে নামার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আমাদেরকে এইসব অনুপ্রেরণার গল্প থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তবে মাঠে নামতে হবে, করতে হবে স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়ন। নিম্নের জাতকটি অনেকেই পড়েছেন, হয়তো এখনো অনেকেই পড়েন নি। যারা পুঁজি নিয়ে চিন্তা করছেন, যারা ব্যবসাতে নামবেন বলে চিন্তা করছেন তাদের অনুপ্রেরণার উৎস হোক নিচের এই জাতকটি; জাতকটি পাঠকের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরলাম।

চুল্লশ্রেষ্ঠী জাতক

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত রাজার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি চুল্লশ্রেষ্ঠী উপাধি পান। তিনি পরম বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান দেখে গণনা করতে পারতেন। একদিন রাজদর্শন করতে যাওয়ার সময় পথে একটি মৃত ইঁদুর দেখে বলে উঠলেন, যদি কোন সদ্ববংশজাত ব্যক্তি এই মৃত ইঁদুর তুলে নিয়ে যায় তাহলে সে ব্যবসায় উন্নতি করবে। এই সময় ভদ্র বংশের এক নিঃস্ব যুবক বোধিসত্ত্বের এই কথা শুনে মৃত ইঁদুরটি তুলে নিলেন। এই সময় এক দোকানদার তার পোষা বিড়ালের জন্য খাবার খুঁজছিল। সে এক পয়সা দাম দিয়ে যুবকের কাছ থেকে ইঁদুরটি কিনল। যুবক তখন এক পয়সার গুড় কিনে আর এক কলসি জল নিয়ে যে পথে মালাকারেরা বন হতে ফুল তুলে ফেরে সেই পথে বসে রইলেন। মালাকারেরা ক্লান্তভাবে সেখানে এসে বসলে যুবকটি তাদের প্রত্যেককে একপাত্র জল ও একটু করে গুড় খেতে দিল। তা খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মালাকারেরা প্রত্যেকে এক মুঠো করে ফুল দিল। যুবকটি তখন সেই ফুল বিক্রি করে আরো বেশি গুড় কিনে পরদিন বাজারে গিয়ে মালাকারদেরকে গুড় ও জল খাওয়াল। মালাকারেরা তখন তাকে কতগুলি ফুটন্ত ফুলের গাছ দিল। এইভাবে ফুল ও ফুলের গাছ বিক্রি করে চারদিনের মধ্যেই তার আট টাকা পুঁজি হল। তারপর একদিন খুব ঝড়-বৃষ্টি হলে রাজার বাগানের অনেক গাছের ডালপালা ভেঙে পরল। বাগানের মালী সেইসব ডালপালা একা পরিষ্কার করতে পারছিল না। তারপর যুবক মালীর কাছে গিয়ে বলল, তুমি যদি আমাকে বিনামূল্যে এইসব ডালপালা দিয়ে দাও তাহলে আমি বাগান পরিষ্কার করে দেব। মালী তাতে রাজি হয়ে গেল। যুবক তখন পাড়ার ছেলেদের একটু করে গুড় খেতে দিয়ে বলল, তোমরা আমার

সঙ্গে এস, বাগানটা পরিষ্কার করে দিই। ছেলেরা খুশি হয়ে যুবকের সঙ্গে ডালপালা পরিষ্কার করে রাস্তায় এনে জড়ো করে রাখল। কুম্ভকারেরা কাঠের অভাবে হাঁড়ি-কলসি পুড়তে পারছিল না। তারা নগদ ষোল টাকা ও কিছু হাঁড়ির বিনিময়ে ডালপালাগুলি কিনে নিল। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে যুবকের তখন চব্বিশ টাকা হাতে রইল। তখন বারাণসীতে পাঁচশ ঘেসেরে বাস করত। ঘেসেড়েরা প্রতিদিন ঘাস কাটতে যেত। একদিন ঘেসেড়ারা ঘাস কাটতে গিয়ে পিপাসার্ত হয়ে পরলে যুবক তাদেরকে জল খাওয়াল। ঘেসেড়ারা বলল, ভাই তুমি আমাদের এত উপকার করেছ, বল আমরা তোমার কি উপকার করতে পারি? যুবক বলল, এখন নয়, প্রয়োজন হলে বলব। এর মধ্যে যুবকের সঙ্গে এক স্থলপথ বণিক ও এক জলপথ বণিকের বন্ধুত্ব হয়। একদিন স্থলপথ বণিক যুবককে জানাল, কাল এক অশ্ববিক্রেতা নগরে পাঁচশ অশ্ব নিয়ে আসবে। এই কথা শুনে যুবক ঘেসেড়েদের কাছে গিয়ে বলল, ভাইসব তোমরা কাল প্রত্যেকে আমাকে এক আঁটি করে ঘাস দেবে আর আমার ঘাস বিক্রি শেষ না হলে তোমরা কেউ ঘাস বিক্রি করবে না। ঘেসেড়ারা যুবকের কথামত কাজ করল। অশ্ব ব্যবসায়ী কোথাও ঘাস না পেয়ে যুবকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা দাম দিয়ে পাঁচশ আঁটি ঘাস কিনে নিল। একদিন জলপথ বণিক জানাল, আগামীকাল একটি বড় জাহাজ মালপত্র নিয়ে বন্দরে আসবে। যুবক তখন দিন ভাড়ায় একটি গাড়ি নিয়ে তাতে চড়ে বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে সে জাহাজের সব মালপত্রের দাম ঠিক করে নিজের নামাঙ্কিত আংটি দিয়ে বায়না করল। অর্থাৎ সেই জাহাজের কোন মালামাল কিনতে হলে তার কাছ থেকেই কিনতে হবে। যুবকটি এবার বন্দরে তাঁবু খাটিয়ে শিবির করে কয়েকজন অনুচর নিয়ে থাকতে লাগল। সে তার অনুচরদের বলে দিল, কোন বণিক তার সাথে দেখা করতে আসলে যেন একজন একজন করে তিনজন আর্দালি সঙ্গে নিয়ে ভিতরে আনা হয়। এদিকে বন্দরে বড় জাহাজ এসেছে শুনে প্রায় একশো বণিক বন্দরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এসে শুনল কোন এক মহাজন একাই সমস্ত মালামাল বায়না করেছেন। তখন তারা খোঁজ নিয়ে যুবকের শিবিরে এসে উপস্থিত হল। বণিকেরা যুবকের শিবিরে এসে শিবিরের ঘটা আর আর্দালির ছড়াছড়ি দেখে ভাবল, এই যুবক নিশ্চয় অতুল সম্পদের অধিকারী। তারা এক একজন করে যুবকের সাথে দেখা করল এবং মালের এক এক অংশ পাবার জন্য এক হাজার টাকা লাভ দিতে রাজি হল। তারপর যুবকের নিজের যে অংশ ছিল সেই অংশও এক লক্ষ টাকা লাভে বিক্রি করে দিল। যুবক দুইলক্ষ টাকা লাভ করে বারাণসীতে ফিরে গেল। এভাবে সেই যুবক একটি মরা ইঁদুর দিয়ে ব্যবসা শুরু করে মাত্র চার মাসের মধ্যে বিপুল ধন লাভ করল। পরে সেই যুবক বারাণসীর মহাশ্রেষ্ঠীর খেতাব অর্জন করেন (তথ্যসূত্র : জাতক সমগ্র)।

ফেরা

সুমেধ তাপস চাক্‌মা

'বাবা হঅ্‌মলে ঘরত এবে?' (বাবা বাড়ি আসবি কবে?)

মার কোমল গলা ফোনের ওপাশ থেকে অন্তর অন্তর চোখ ভিজিয়ে দেয়। বছরখানেক নাকি বেশি? ঐ দূর পাহাড়শ্রেণি পেরিয়ে বাড়ি যাওয়া হয়না কতদিন? অন্ত নিজেও ভুলে গেছে।

অন্তর মন আবার নতুন করে অস্থির হয়ে ওঠে। উফ! ঘরের দরজায় কদিন পা পড়েনি! আহা ঐ সবুজ পাহাড়সারি দেখা হয় না কদিন ধরে, হাইকিং হয় না বন্ধুদের সাথে। বন-পাহাড়ের উঁচুনিচু রাস্তায় হেঁটে গ্রামে যাওয়ার দিনগুলো অন্তর চোখে ভাসে। অন্ত ছুটছে ঘরের অদূরে রাজনি বাপের বাগানে, তাড়া করছে ছোট্ট মুক্ত-ইথিকা-বগারা। শো শো বাতাসে ভেসে আসছে আমের গন্ধ। অন্ত আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝড়ো বাতাসে আধো আঁধারে টুপ টুপ করে আম পড়ে আর সে ইচ্ছেমত কুড়োয়। কুড়নো শেষ হলে রাজনি বাপের ভিটেয় ইট মেরে ভো-দৌড় দেয় অজানার উদ্দেশ্যে...

ভোর সকালে ভারী কুয়াশার মধ্যে হাঁটা ওর পুরনো অভ্যাস। ব্রাশ মুখে হাঁটতে হাঁটতে সে একলা চলে যায় চব্বিশ মাইলে। এই এলাকাটা অনেক দূরে। নির্জন একটি চৌরাস্তার মোড়। এখানে বসে অন্ত কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় আর অপেক্ষা করে দিনের প্রথম বাসের জন্য। প্রকৃতি শান্ত। মাঝে মাঝে দূরে দু'একটা চেনাজানা পাখি ডেকে ওঠে। এই ডাক অন্তর চিরচেনা; জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই ডাকগুলো প্রতিদিন শোনা হয়। যেন পরম প্রতিবেশী এই প্রাণীগুলো!

মোড়ের ডানপাশে এক বিশাল টিলার উপরে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে বাস করে গোটা দশেক সিপাহী। টিলার অনেক নিচে মোড়ের সমতলে এক পুকুর। দেশ স্বাধীন হয়েছে চল্লিশেরও আগে। অন্ত বুঝতে পারে না আজও চল্লিশ বছর পর এই অজ পাড়া-গাঁয়ে ব্রিটিশ আমলের ঐ ক্যাম্প কেন রেখেছে সরকার! এখানে চুরিচামারি নেই ডাকাতির আশঙ্কাও নেই। এখান থেকে থানা সদর খুব দূরে যে তাও নয়। তারপরও এমন একটা এলাকায় আধাসামরিক পুলিশের লাল ড্রেস কেন? বেচারাদের ঘরদোর অনেক দূরে, ঈদের ছুটিতেও বাড়ির মুখ দেখা যায় না। ক্যাম্পে বসে মাছি মারা কোন কাজ নেই। পানি আনতে গেলে বানানো সিঁড়ির ২৬৭ ধাপ বেয়ে নামতে হয়। এত খাটিয়ে মেরে অল্পকজন

লোককে বাবুরাম সরকার এখানে রাখলো কেন? গেল বছর এক বুড়ো সেপাই জ্বরে মরে গেল। বুড়োর সাথে অন্তর অল্পস্বল্প খাতিরও ছিল। দেশের বাড়ির গল্প শোনাত অন্তকে, পাহাড়ে পরবাসী বুড়োর মুখে সমতলের গল্প। বেচারা শেষ জীবনে ক্যাম্পেই মরে গেল! অন্তর বড্ড কষ্ট লাগে লোকটার কথা মনে পড়লে।

বর্ষাকালে বাড়ির সামনে ধেবার পানি এসে হেডমাস্টারদের বিশাল ক্ষেত ডুবে বিল হয়ে যায়। অন্ত সাঁতার জানে না। কিশোর অন্ত ডুবে মরার ভয় ভুলে নৌকো নিয়ে একাই নামে শাপলা-ডাটার স্তূপ গড়তে। ঐ ডাটার স্বাদ ভালো, ভাজলে কলমির চেয়েও মজার। অন্ত ভালো নাও বাইতে জানে। দ্রুত সে ডাটা কুড়িয়ে চোরাই ট্রিপের ইতি টেনে পদ্মবাপের নৌকো ঘাটে ভিড়ায়। পদ্মবাপ জাত-শিকারি এবং জাত-মাতাল দুটোই। ইদে (ফাঁদ) পেতে বগা ধরতে এলাকায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর নাও চুরি করে ফাও ট্রিপ মেরে ধোলাই খায়নি এমন ভালো কপাল অন্তসহ আরো গুটিকয়েক ছোকরার আছে!

বর্ষার বাকি সময়টা ছুটিতে সে এক নানার বাড়িতে কাটায়। পাহাড়ের অনেক ভেতরের দুর্গমে নানার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। চেঙ্গীর জল গড়িয়ে সেই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে অনেক দূরে মিশেছে কাপ্তাইয়ের আধারে। নদী এখানে সাগরের মতো। মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। সেখানে অনেক নৌকো, অনেক দ্বীপ। দ্বীপে দ্বীপে ঘর, দ্বীপে দ্বীপে দোকানপাট-স্কুল। সাঁতারজ্ঞানশূন্য অন্তর ভয় করে না। নানার নৌকো নিয়ে সে একেক দ্বীপে ঘুরে বেড়ায় একা একা। কোথাও এক দোকানে শেকলে বাঁধা বানর নিয়ে বাচ্চাদের প্রবল আগ্রহ চোখে পড়ে। কোথাও একটি টিলার ঘর থেকে ভেসে আসে মদ ও মদ্যপায়ীর জড়ানো গলার আলাপ। অন্ত কোথাও নামে না, নৌকা বেয়ে সামনে চলতে থাকে। এই নদীর রাস্তায় এক ছোট্ট দ্বীপে কোন ঘর নেই। কেবল আছে নির্জন ছোটবন আর দখিনা হাওয়ার গুঞ্জন। অন্ত যাবে সেখানেই, সেই নির্জন রাজ্যে। ছোট্ট বনে কোন শব্দের অত্যাচার নেই বাক্য নেই শুধু বাতাস আর প্রকৃতির গানের মগ্নতা। অন্ত ডুবে যায় সেই গান ছেড়ে জগতের সব আলেয়ায়...

‘ঐ হালা কি হইল তোর? চাচীর ফোন নাকি? বাসায় যাইতাছস তাইলে?’

যা এতক্ষণ কোথায় পড়েছিলাম! বন্ধুর তিন প্রশ্নে ফ্ল্যাশব্যাক থেকে অন্ত ফেরে বাস্তবে। আজই বাসের টিকেট কাটতে হবে। ঘরে যাওয়া হচ্ছে, অনেকদিন পর...

শিশির চাকমার কবিতা

কচ উত্তে ধুব সিবুদি

চোত মাচ্চে দাঙা যেইয়ে জুমর আরাচাগ নিআলঝি কাজেই ধবধবা
বোজেগর পত্থম লোবিয়দি ঝরর নোনেইয়্যে মাদিদ বেকুয়োচ থেঙকুচ
দেমতুলে উত্তরো কালচ্চে মেঘর হারাচোক্কেনি নাখাচ গোরি
জুম্মবী শুনং ন শুনং হাদর বাঙরি ঝনাৎ ঝনাৎ গোরি
কাবিল হাদ বাবায় কুরুমোত, জলজোলে সনারঙ বীজধান মাদি উদন চনঙ চনঙ
বুনি যায় এগেমে আওঝর আত্তবো স্ববনর জুম ভুই।

এ য়েল জুমখেত, কাজায় কাজায় পদনা বন, লকলোক্কে জেদেনা গাচ্, লেলম পাদা জাঙালে শাক, বুকপাদি নিগিলেমোক্কে থুর, পাগানা সিন্দিরেত সিমপুক, অজার বুগত সুদোহলা ফুল, হেল তদেক ঝাক, সনারঙ ফুত্তে সদরগত নিলোজ তেঙতেঙোরি আ' পত্তাপত্তির নিগুচ নাচ।

এ জুম মর, ইদোর থুরত জুম, স্ববনত জুম, এ মাদি য়েল ঝার মর
এ ছড়া গাঙ কলগ লাঙেল মর
বাযি থানা এ জুমত মরানাও এ জুমত নয়দ কন এক কলগত নয়দ কন এক লাঙেলত।

খালিক স্ববনানি ইরুক কাজকাবাচ্চে পিদোলর রঙর আরুক সাঝে
নিগুচ মেয়্যালোই মোরেইয়্যা স্ববনানি তেপ পোচ্চে য়েল কচ্ উত্তে মুরোউনর কানজাবাত
বারি খেই খেই রগোনি অয়।

চোক্কুনরে পরাদি কমলে য়েল মুরোউনত্তুন য়েল কচ উদি পুর উত্তে অলাক
পরানে পরান বান্নে, জাদে জাদ বান্নে, চেঙেই মেয়োনি কাজলঙ দেজকুলে বান্নে,
এ খিচ্চে বান ছিনি যেই বলবলাত সদি ভাঙা ছিনেকুদোক চদর মিলার আরুক ফুদি উত্তে।

স্ববনানি ভাদ আযিন মাচ্চে ছিনেক কুদোক ভুলং ফুলোদগ সাদাঙা একপোলে দগিন'বোয়েরে উড়ি যায়,
ম' কবিতা লিগিবার আগমুলিম রুচ্চেল, সরঙকানি আ' সজপদরানি আহ্নোয় কর বদে
ম' কবিতা লিগিবার তিরোচ্চানি অই উধে পালঙে ধোচ্চে ভাচ্ মিলার সতপোত্তে বনিজেচ
ম'কবিতা লিগিবার তম্বার আওচ্চানি অই উধে শামুক সিলোনর চগলাত্তুন কচ উত্তে ধুব সিবুদি।

শামুকের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা চুন

চৈত্র মাসে পাহাড়ের বন পুড়িয়ে আবাদের জন্য তৈরি জুম পাহাড়
বৈশাখের প্রথম ঝড়ের নরম মাটিতে উৎসুক মানুষের পদচিহ্ন
উত্তরের বৈরী কালচে মেঘের খেলা উপেক্ষা করে জুমিয়া রমণীর কোমল হাতের ছোয়া
কোমড়ের কুরুমে, তার নরম হাতের স্পর্শে চনচনিয়ে ওঠে কুরুমে রক্ষিত সোনারঙ
ধানবীজ, এভাবে বুনে যায় স্বপ্নের জুম খেত।

এ সবুজ খেত, খেতের পাশে কচি ডগা বাঁশের বন, লকলকে জেদেনা গাছ, লেলম পাতা,
জাঙালে শাক, কচি ভুট্টার থোর, পাকা সিন্দিরা, জুমিয়া সুতার ফুল, সবুজ তোতা পাখির
ঝাঁক, সোনালী জুমিয়া গাঁদা ফুলের ওপর প্রজাপতি আর ঘাস ফরিঙের নিবিড় নৃত্য ।

এ জুম পাহাড় আমার, অন্তরের গহীনে জুম, স্বপ্নচারিতায় জুম, এ মাটি, সবুজ বন।
এ পাহাড়ী ছড়া গাঙ, উপত্যকা, উঁচু পাহাড়ের সরু পথ আমার,
বেঁচে থাকা এ জুমকে নিয়ে, মৃত্যুও এ জুমে নয়ত কোন এক পাহাড়ী উপত্যকায় নয়ত
কোন এক পাহাড়ের খাদে।

কিন্তু ইদানিং নিবিড় স্বপ্নগুলো তামাটে রঙের হয়ে ওঠে
পরম মমতায় মোড়ানো স্বপ্নগুলো সবুজাভ রঙ হারানো বিবর্ণ পাহাড়ের খাদে ধাক্কা খেয়ে
রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।
চোখের আড়ালে সবুজ পাহাড় কবে কখন বিবর্ণ হয়ে গেছে
পাহাড়ের মানুষে মানুষের অন্তরের গহীন বাঁধন কবে কখন ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে
এ যেন বলাৎকারে ছিন্নভিন্ন নগ্ন বিধ্বস্ত রমণীর মুখ।

আমার মায়াবী স্বপ্নগুলো শরতের ছিন্ন কাঁশফুলের মত অহংকারী দখিনা বাতাসে হারিয়ে
যায়।
আমার কবিতা লেখার খোরাক, বিষয় আশয়ের জায়গাটিই ধ্বসে পড়ে
আমার কবিতা লেখার তৃষ্ণাগুলো হয়ে ওঠে পরাস্ত সন্তানহীন রমণীর দীর্ঘশ্বাস
আমার কবিতা লেখার ইচ্ছেগুলো হয়ে ওঠে শামুকের খোলস থেকে বেরিয়ে আসা চুন।

জেদেনা –এক ধরনের যব, **লেলমপাদা ও জাঙালে শাক**– পাহাড়ী শাক, **সিন্দিরা**–জুমিয়া
ফল, **সিমপুক**–এক ধরনের পোকা, **কুরুম**- বেতের ঝুড়ি।

স্বাগতম চাকমার কবিতা

জন্মভূমির প্রতি

নিন্দুকেরা বলে, আমি অনায়াসে এক হতাশাক্লান্ত, পলায়নবাদী কবি হতে পারি; কারণ-
শহীদ মিনারের রক্ত উদ্বেল শ্লোগান আর সমাবেশ শেষে চিরচেনা তল্লাটে ফেরার পথে
অকস্মাৎ ঢুকে পড়ি 'এরাম' কিংবা 'শাকুরা'য়। গোগ্রাসে গিলে ফেলি
চারটি আস্ত ভল্লুক।
আর ভাবতে থাকি–
কী দিয়েছে এই করুণ রাষ্ট্র আমাকে, দুঃখ যাতনা ছাড়া?
গৃহহীন বেঁচে আছি আজ পঁচিশটি বছর!

উদ্বাস্তু তিনবার জন্মভিটা থেকে, পরদেশে পরগৃহে আশ্রিত আগন্তুক এক
জীবনকে দেখেছি বাঁচার আকুতিতে চলেছে অবিরত-
পাহাড়-পর্বত, জলাভূমি, অরণ্য পেরিয়ে নতুন ঠিকানার খোঁজে,
দূর কোনো লোকালয়ে;
অনাত্মীয় করুণা, আর মমতার মিশ্রণে বাঁচতে মৃদুবৈরী
জল-আলো-হাওয়ায়।
আজও নিজভূমে পরবাসী।
জন্মের পর অর্থহীন হারিয়ে গেছে চারটি দশক বা তারও বেশি!
(এর অর্থমূল্য কত হতে পারে হিসাব কষে দিন, কারণ আমি আজও কপর্দকহীন।)

মমতাময়ী প্রিয় মাতৃভূমি আমার, লাখো শহীদের রক্তে ভেজা রাজপথে শ্লোগানে শপথে
জাতি, বর্ণ, গোত্র ভুলে তুখোর মিছিলে সমতার স্বপ্নে হেঁটেছেন আমারও পূর্বসূরি,
এই মাটির মঙ্গোলয়েড জনধারার সন্তান। শ্যামবর্ণ নয় যদিও তাদের মুখশ্রী-শরীর
তবুও সমান গর্জনে শত্রুর দর্প নিরলস চূর্ণ করেছে তাদেরও অব্যর্থ রাইফেল, মেশিনগান।
আমাদের যৌথ নির্জ্ঞান তাদের তরে যেন বিশ্বাসঘাতিনী ব্ল্যাক উইডো এক
আমাজান অরণ্যের। জাতীয় ইতিহাস তাই নিরুত্তর তাদের নামে, মুছে দিয়ে
যত বীরগাথা, 'স্মৃতি-সত্ত্বা-ভবিষ্যৎ'। জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনারেও
অচেনা তারা প্রকৃতি অরণ্যের স্মৃতিবাহী যোদ্ধা বলে?

আমি তাদেরই উত্তরসুরি এক, ইতিহাসের ইতি-নেতি, ছায়া প্রচ্ছায়া খুঁড়ে বহু কষ্টে সৃষ্টে
জেনেছি মুক্তিযুদ্ধের যুগ-যুগান্তের ইতিহাস, যত যোদ্ধার নাম ও বীরগাথা।
সেখানে সবাই আছে - জাতি, ধর্ম, বর্ণের সীমানা পেরিয়ে মুক্তির ঐকতানে যুথবদ্ধ

প্রাচীন মানবদলের মতো; যুগে যুগে পাহাড়ে-অরণ্যে-সমতলে, মরু বা সাগরবেলায় যৌথ জীবনের মাধুর্যে তারা জেনেছে স্বাধীনতার মানে, মুক্তির অতুল্য স্বাদ।

অথচ আজ দেখি–
সেই সহযোদ্ধারা অনেকে আজ অচেনা ঈগলের বেশে
আমাদের প্রাচীন গ্রাম আর অরণ্যে এসে
কেড়ে নিতে চায় সবকিছু
জমি, জলা, বাস্তুভিটা, পূর্বপুরুষের সমাধি, মায়ের শুভমানস আর
বোনের কমনীয় পবিত্রতা; অনন্তের স্মৃতিবাহী কালের পুরাণ,
আনন্দ-হাসি-গান, পাহাড়চূড়ায় পবিত্র নিঃসীম নীলিমা
আর আমাদের সবটুকু প্রশান্তি, ভালোবাসা।

প্রিয় মাতৃভূমির কাছে তাই নিবেদন– ওদের নিবৃত্ত করো, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শে, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত অহংকারে, জাতি-ভাষা-বৈচিত্র্যের উদার সৌন্দর্যে। কারণ– আমিও এ মাটির কবি; মাতৃভূমির প্রাগৈতিহাসিক ও আধুনিক জন্মরেখার অনুকারে গর্ভভ্রূণ হতে জানি এ মাটির নিষ্কলুষ জল, নীলিমা, আলো-হাওয়া, দুঃখ-সুখের উপর আছে আমারও যে নিরঙ্কুশ অধিকার।

ফারবান্নে না ওয়াঙজা-এর কবিতা

পল্লা

সে পিত্তিমি পরেদি ইধু এই পরান থুমগুরি আরো যক্কে ফিরি যেম
ভালক জনর চোবাসাল দেঘিম্মোয়, ভালক জনর চোবাসালত তাঙোন হানির
এগুচ্চে বাচ্চো হয়ত চিকচিক্কেগুরি থিগেয় থেব।
কুদুম আহ্‌দে আহ্‌দে হয়ত কুদুমান যেব', ফেলে এচ্চে বোন, ভেই, আত্তো-বরঙা কায়
মরি যেব' সদর কুদুম কোয়েঙআলু লুদির মরি যানা সান।

হয়ত লাগত পেম্বোয় ফেলে এচ্চে সমাজ্জেগুন
মর কোচপানা নুদিবানি হোয়মন্তিরে, কবরক ধানর জুম' চাবত
আহ্‌দত কুচি মামরা নুন এক কোলোয় ধার চারি ধোয্যে
বুগত আদপুরাননে হাদি, আদপুরাননে পিনোন
মুয়োত আহজি নোনেয় নোনেয় হুত্তেরি মিজেল্ল্যে
আজাগুরি কিরবেগুরিলেই যেন তার বুগো তিরোচ মরে। বুঝ মানে।

সে পিত্তিমিগান হিঝি তানে
লাঙনির কোচপানাগানই ঝাদি যেবার পাগল গরে
ম' সদর পিত্তিমিতই মুই যেম্বোয়, তোমাত্তুন মুই পল্‌লে যেম্বোয়।

অনুবাদ : চলে যাবো আমার পৃথিবীতে

সেই পৃথিবীর পরে, এখানে এই জীবনের শেষে আবারো যেদিন ফিরবো
অনেকের কবর দেখবো, অনেকের কবরে শুকনো ফুলের
গুচ্ছ হয়তো একলা পড়ে থাকবে।
আত্মীয়তায় হয়ত বা রেখে আসা বোন, ভাই, দাদু-দাদী
ছিঁড়ে যাবে বন্ধন, যেমনটি কোয়েঙ আলু লতা মরে যায়।

হয়তো দেখা হবে ফেলে আসা বন্ধুদের
আমার প্রিয়া হৈমন্তীকে, কবরক ধানের জুমে
হাতে কচি শশা, একটুখানি নুন, কাঁচি
পরনে ফ্যাকাসে হাদি, পিনোন

মুখে অভিমানি হাসি
সোহাগে বুকে টেনে নিলেই যেন তার অভিমান ভাঙ্গে।

সেই পৃথিবীটা ভীষণ টানে
হৈমন্তীর ভালবাসাটাই ফিরে যাবার জন্য বেশি পাগল করে
আমার পৃথিবীতে আমি চলে যাবো, তোমাদের রেখে, এই পৃথিবী ছেড়ে।

হিজো

মনতুক্ক' মনত ডুবি যিয়ে, মাধার মগচ ওই যিয়ে উগুচ্চে ভুই
চিত্ ঘিলে পাত্তর ওইয়ে, আগ্নেয়গিরি লাভা সান ম' লো বয়।
মুই পাত্তর মুই রম মুই জল্লাত মুই মানবতা সিগেরি
ম' বিরুদ-বিধি ন' মানঙ মুই, নুরুলি হুয়ে দিম কঙর জোগারপারি।

মর মরা লাঝ পুড়ি আগে মর আওজর জুম ঘরত। মর বেবের মরা হিজেক, হিজেক কারি ঘুরি ফিরে
অমানবতার কালা মেঘে মেঘে। উতারার হিংস্র হুচে হুচে। মোনর অজল নিচ পদে পদে।
মুই সিনি
নিবের চাঙ বেবের তুমবাচ, মুরো আন্দল দিবের চাঙ মগদাগুনর পেরেদর চোক' সান রাঙা চোকত্তুন।
বলহিজি নিগুচ গুরিবাত্তে, গিঙেরে মুগুরেবার মুগোর তারারে দেঘাঙর।

মর মরা লাঝ পুরি আগে চেঙে মেঅনি কাজলঙ কুলে। তোমা ধাগত।
মুরি আগঙ কন আলত্যে
সেনে মরনর ডর ডোরে কি অব, সচ পাদন, গজক গত্তন বুগর ঘরভিদে
আহ্রেবার আ' কি আগে। আমারে আমি আহরিয়েই কন আলত্যে।
ভাঙি ফেল' জুম্ম ভুলুক-চুলুক হুন্দোল, দেবাপ্রাক ওই জাগি উদ', পিচ্চোল গর উদোন
তুচ্চ তুচ্চ গুরি দুঅ তারার ইধুঅর বজত্তি। সুঞ্জুক লামোক জুমবুগোত।

অনুবাদ : ভেঙ্গে দাও আস্তানা

তাজা মনটি মনে ডুবে গেছে, মাথার মগজ হয়ে গেছে অনাবাদি জমি
কলিজাটুকু পাথর হয়েছে, আগ্নেয়গিরির লাভার মত রক্ত বহে।

আমি কঠিন আমি পাষাণ আমি জল্লাদ আমি মানবতা শিকারী
মারার নীতি আমি মানি না, বিচ্ছিন্ন করে দেব মুণ্ড, করছি চিৎকার।

আমার লাশ পড়ে আছে আমার প্রাণের জুমে। আমার বোনে বীভৎস চিৎকার, ঘুরে-ফেরে অমানবতার
কালো মেঘে মেঘে। ওদের হিংস্র পাড়ায় পাড়ায়। পাহাড়ের উচু-নিচু পথে পথে। আমি ছিনিয়ে নিতে চাই
আমার বোনের পাহাড়িয়া ঘ্রাণ, পাহাড়ের আড়াল দিতে চাই হায়েনাদের রাক্ষসের মত ক্ষুধার্ত দৃষ্টি হতে।
শেষ করে দেওয়ার মত আমি হুমকি দিচ্ছি।
আমার লাশ পড়ে আছে চেঙ্গে, মাইনি, কাজলঙে। তোমার পাশে।
মরে আছি অনেক আগেই

তাহলে মরণকে ডরে কি হবে। লুঠে নিচ্ছে, দখল করছে ভিটেমাটি
হারানোর আর কী আছে? আমরা আমাদের হারিয়েছি সেই অনেক আগে।
ভেঙ্গে ফেল জুম্মর সরলতার বন্ধন, মেঘের ডাকের মত জেগে ওঠো
ভেঙ্গে দাও তাদের আস্তানা। শান্তি নেমে আসুক জুমে।

আলোড়ন খীসার কবিতা

মাটি ও মা

আমি এবড়োথেবড়ো খাঁজের সরল বুনোপুত্র
কি করে বুঝবো সমান্তরালের চৌকস পা ফেলা

কোন এক আলোদাত্রী
মায়ের স্নেহে আদরে
সংগ্রহ করতে এসেছিলাম
দু-এক মুঠো আলোর সাহস

যা পেয়েছি তাই নিয়েছি মুঠোভরে
ফিরতি পথে আলোর ভাগ চাইলো
এক জন্মান্ধ ব্যবসায়ী

তার সাথে আলো ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হতে গিয়ে
ভুলেই গেলাম পেছন ফেরার সঙ্গীত
মা রে, আমি বয়েই বেড়াচ্ছি
মাটির ঋণের সমঝোতা

খুঁজছি

তুমি আমার
দেহের অনেক কাছে
মনের অনেক দূরে
যেমন একলা পাখী
খাবার তুলে পাড়ি দেয়
অজানা গন্তব্যে
অলীক টানের খোঁজে
একাকী দাঁড় টানছে
নিভৃত মাঝি মন আমার
কৈ তারে পাই বলো
আমার কোন পাথারের কোণে?

হেলায়-ফেলায় নিঃস্ব
সে করেছে আমায়
আবার নিজেই কাছে টেনে
ভরিয়ে দিয়েছে নিঃস্ব নদ
আবার ফেলে গেছে
একা একা হাঁটার ভয়ার্ত ভ্রমণে
এখন হাঁটছি আর খুঁজছি
আমাদের মায়াবী অস্থিরতা

মুই

ভালক দিন অল' মুরি পুরি ইলুং
মরামাঞ্জ্য সান আমা আদামর পধন্দি
এক্কানাও হবর ন' পাঙ
ইচ্চ্যে তারারে চেবাত্তে যেইনেই দিঘিলুং
মুইঅ তাঁরা লঙে মুরি পুরি আগং এক্কুই লাইনদ

অনুবাদ : আমি

বহুকাল আগেই মরে পড়ে ছিলাম
এই মৃতপ্রায় নগরের জঙশনে, বুঝতে পারিনি
আজ স্বজনের মৃতদেহ সরাতে গিয়ে দেখি
আমার নিথর দেহও পড়ে আছে
লাশের সারিতে, খুবই অযত্নে

সুদীপ্ত চাকমা মিকাডোর কবিতা

চাদিগাঙয়র চোগপানি

সবন দেগি এদেজ আমার হুজিয়ে ভরি থেবো
মানজর মনত সুগর সবন ভাজিব
লিয়ন পোজনে হোচপানায়
আমা এ হিল চাদিগাং ভাজিব।

হি পেইয়েয় আ হি আরিয়েই এ দেজততেই
হিও হি ইজেব মিলে চেইয়েই?
লাম্বা ২৫ বজরর পজজন
হাজার মানযর আরিয়ে হদক সবন
বারঙ বার পুগদি হানাদি রিনি চায়
ঝারে ঝারে, বাজ গাজে হাদেইয়ে হদক
এই আজায় বানা হিল বুগত ফুদিব ছদক।

নানান তান্যে বান্যে গরি
হাদি গেল আরো ছবো বজর
১৯৯৭ সালত ঐ গেল পার্বত্য চুক্তি
হুদু আজি গেল হিল মানেয়র মুক্তি

গাঙে ছড়ায়, মোষ গরুয়ে ভরি এইল
আমা সবননানি
হিল চাদিগাং এইল আমা বেগর জিংহানি
গুড়ো নেই বুড়ো নেই
মিলে মরদর ইজেব নেই
চাদিগাং অর দাবিতেই উজেবার মিছিলত
নেই চিদে আগে হি এ হবালত?

ইককু হেজান আগি আমি বেগে
মুয়ে নেই হিয়েয় নেই রিনি চেলে দেগে
চোগ ভরি থায় পানিয়ে
হেওয় বুজি ন পারে এ পানি হি হুজিয়ে ?

তুমি আমি চেই আগি
যেদক দিন বাজি আগি
জাদতর ভালেদ অব
নুঅ রঙে বুনন্যে নুঅ পুরোনে সবনেদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চোখের পানি

স্বপ্ন দেখি এদেশ আমার খুশিতে ভরে থাকবে
মানুষের মনে সুখের স্বপ্ন ভাসবে
দেয়া নেওয়ার ভালবাসায়
আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাসবে।

কি পেয়েছি আবার কি হারিয়েছি এই দেশে
কেউ কি হিসেব করে দেখেছি?
দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস
কত হাজার মানুষের স্বপ্ন হারিয়েছি
আশার ছিদ্র দিয়ে দেখে যায় বারবার
বাঁশ গাছে, ঝাড় জঙ্গলে রাত কাটিয়েছি কত
শুধু এই আশায় হিলের বুকে আলো ফুটবে।

নানা রকমের সময়ের মাঝে
কেটে গেলো আরো ছয়টি বছর
১৯৯৭ সালে হয়ে গেলো পার্বত্য চুক্তি
কোথায় হারিয়ে গেলো আমাদের মানুষের মুক্তি?

আমাদের স্বপ্নগুলো ভরা ছিল
খাল আর ছড়ায়, গরু মহিষে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল আমাদের সকলের জীবন
শিশু নেই বৃদ্ধ নেই
ছেলে মেয়ের হিসেব নেই
পার্বত্য চট্টগ্রামের দাবির মিছিলে
চিন্তা ছিল না কি আছে কপালে?

আজ কেমন আছি আমরা সবাই?

মুখে নয়, শরীরে নয় তাকালেই দেখে
চোখ ভরে থাকে পানিতে
কেউ জানে না এই পানি কার খুশিতে ?

আমরা সবাই আছি তাকিয়ে
যত দিন আছি বেঁচে
জাতি এগিয়ে যাবে
নতুন রঙে বুনা নতুন স্বপ্ন দিয়ে।

হেগা চাক্‌মার কবিতা

ভাবনার সাগরত্ সাহিত্য নাগরত্

পাজ বঝর পর মরি যেম্
দশ বঝর পর বই ছাবেম্
তারপর রিনিচেম; চাঙমা সাহিত্য হুদ্দুর উজেল...
ইয়্যান যুনি অয় আমা চাঙ্‌মা সাহিত্য চর্চার বাস্তবতা
সালেন এক্কাগুরি শুন্যো ম' কধা-
জেদা শিবচরণ আর কোনদিন জন্ম ন' লব তমা দেঝত;
যে দেঝ্ জেদা মানুচ ন' চিনে
মরারে পূজে বানেনেই দেবেদা
সে দেঝর ঘিনে জেদা মানুচ্চুন ওয় যাদন চেবেদা।

এ-মাদিত্ থিয়েনেই মুই কোই যাঙ্‌অর
পাজ বঝর পর এ-দেঝর কী অব
দশ বঝর পর সিয়্যান মাদেনেই
কী চেদলের তর অব?

সাহিত্য বানা বিজগ' পাদাত্ মাদেলে
আওজ' বাপ্পোরে গরম পানিত্ গাদেলে
দাদ ভেঙেদে আজিবো বানা, পরে
ত' পোবুয়্যা ত' ইন্দিই ঘাজিবো বানা।

ধাগ' কধায় আঘে-
ঝুল থেক্কে ঘাদ', সময় থেক্কে আ্‌দ'
বুঝি থেলে ম' কধায়ান এক্কাগুরি মাদ।

ভাবনা আমার চাক্‌মা সাহিত্যের প্রতি

পাঁচ বছর পর মরে যাবো
দশ বছর পর স্মরণ করবো স্মারক গ্রন্থে
অতঃপর মূল্যায়ন; চাক্‌মা সাহিত্যের অগ্রগতি কদ্দুর হলো...
এই যদি হয় চাক্‌মা সাহিত্য চর্চার বাস্তবতা
কিংবদন্তী কবি শিবচরন কোনদিনই আবির্ভূত হবেন না
এ'দেশমাতার কোলে;
প্রাণবন্ত জীবনকে মূল্যায়ন না করে
মৃতপূজায় মেতে উঠে যে দেশ
সে-দেশ জীবিতদের নয়, মৃতদের স্বদেশ।

এই মাটিতে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করে যাচ্ছি
পাঁচ বছর পর এ দেশ কোথায় দাঁড়াবে
দশ বছর পর তা ভেবে কী (বালছেঁড়া যাবে) ফায়দা হবে?

পুরনো ইতিহাস খুঁড়ে যুগের সাহিত্য ফেলে
আহ্লাদের পিতার চেতনায় তপ্ত জল ঢেলে
বিদ্রুপের মৃত্যুহাসি দেখবে তুমি,
তোমার সন্তানও হাঁটবে তোমারই পথে
গ্লানির অনলে পুড়ে যাবে আমাদের মাতৃভূমি।

ভাষণের ভঙ্গিতে প্রবাদের সঙ্গীতে উচ্চারিত এই আহ্বান-
সময়ের চাহিদায় আমরাই সজাগ
নবীন প্রাণ
আমরাই জাগাবো
রাগহীনের বুকে দেবো চেতন-রাগ
জ্বালিয়ে দেবো পৃথিবীর বুকে চাক্‌মা সাহিত্যের চেরাগ।

এত্তমান মরি যিয়্যেয় ইদোত ন' উদের তরে

তুই আমা ইদু নেই, তর কোন কধা আর ইদোত ন' উদে!

নিত্য যে বেলান উদিদ' তরে দেঘি, ফুদি উদিদ মোন-ফুল,
ন' উদোন ফুদি- ভাগ্য দেঝত্ উড়ি যায় ইরি দে মিলের চুল;
শুরু অয় দুরগুদি।
এত্তমান মরি যিয়্যেই আমি! ঘরে ঘরে মরালাঝ কানি উদিলেও
ন' শুনি ন' বুঝি- সিমে গাজত্ মনার কার্‌কাজ্জে র'য় বুক ফাদিলেও
ঝুবো সেরে মুরগুজি!

চোঘ' পানি শুগে যানার পর আমিও জান্নেই
কেনে এযে নুনজো পানির ঝর;
চেঙে-মেইনী-কাজলঙ পার ওনেই
দেঘা নেই আদামানি আমনর।

মনপোড়া-পেটপোড়া-ঘরপোড়া জাদ আমি, পুড়ি যার আমন' মনানি
তু'দ আমি গম আগি! বিন্ন্যে গরম চা, বিল্ল্যে আওচগুরি চটপটি
রেদ বাড়িলে কয়েক্কান ব্রেকিং নিউস মাদেলে উম পেই;
এই উমে ঘুম নেই, আরো কিচ্ছু তোগাই
লৌ-রঙে রাঙা অয় য়েল জুম' ভেল পাদি

যে দেঝত্ ঘুম ন'এযে সে দেঝর মাঞ্জে আরো কিচ্ছু তোগান
আরো কয়েক্কান দোগান জাগি উধে গণ'আদামত
আরো কিজু বেজা-কেনা অয় বাজার' লুকদি খলাত;
আরো কিজু মাঞ্জোর ভুক্‌মরে বিচ্চ্যোন' চিবাপিপ্ল্যে এরা-দলাত্

এই অঘুর রেদোত্ তুই নেই, নেই তর কোন কধা ইদোত্
তুই ছাড়াও আমার কোন দুঘ নেই ভাবদে ভাবদে একদিন মুইও নেই!

বাজি আগ' যারা তুমি এত্তমান কী মরি যিয়্যো
যিদ্দুর মরিলে জেই উদি ন' পারে,
নিজ' বাচ্ নিজরে চিনি ন' পারে, সেত্তমান মরি যিয়্যো!

এতটাই মরে গেছি তোমাকে মনে পড়ে না

তুমি নেই, কেউ নেই তোমাকে স্মরণ করার

ভোরের প্রতিটি লাল সূর্যের মত তোমার আবির্ভাব
পাহাড় চূড়ায় ফোটাতো অজস্র মোন-ফুল।
তুমি নেই- ফোটে না সে ফুল
নিয়তির রাজ্যে উড়ে যায় রমণীর খাপছাড়া চুল
মানুষের বুকে জ্বলে না আশার দীপ
মৃত্যুপুরীর অচেতন জুমে বেঁচে থাকি রিপরিপ।

আমরা এতটাই মরে গেছি!
গৃহকোণে নিথর লাশগুলো কেঁদে উঠলেও
শুনতে পাই না
গৃহযুদ্ধে স্বদেশী তরুণের প্রাণ বলীদান
ঘুম ভাঙ্গায় না।

চোখের সমস্ত লোনা জল শুকিয়ে যাওয়ার পর আমরাও দেখেছি:
পোড়া গ্রাম
ন্যাঁড়া পাহাড়
রক্তাক্ত নদী।
কত পাহাড় নীরব দাঁড়িয়ে, বেঁকে গেছে কত নদী চেনা পথ হারিয়ে
তবুও খুঁজেছি একটি আদিবাসী আদাম যৌথ জীবনের স্বপ্নচূড়ায় দাঁড়িয়ে।

জীবনের পোড় খাওয়া বাঁকে আমরাও শিখে নিয়েছি সুবিধাবাদের সকল লাম্পট্য;
তবুও এ জীবনে একফোঁটা উষ্ণতা নেই, দু'চোখে একমুঠো ঘুম নেই
ভিক্ষার ঝুলিতে আরো কিছু চাই
জুমের সবুজাভ নরম বিছানা রক্তগঙ্গায় ভেসে যায়।

বন্দি আমাদের স্বকীয়তাগুলো ভাবাদিপত্যের চালাকি শিকলে
বন্দি আমাদের স্বপ্নরেখা, রক্তের যোগান গেছে বিফলে
আমাদের কৃত্রিম খোলসগুলো পুড়ে নি রোদে তাই
রমণীরা এখনো ইজ্জত খোয়ায় পরিপাটি বিছানায়।

তুমি নেই, নেই কেউ তোমার বাণী স্মরণ করার
তোমার অনুপস্থিতিতে আমাদের কোন খেদ নেই

ভাবতে ভাবতে একদিন আমিও নেই!

বেঁচে আছো তোমরা যারা–
এতটাই কি মরে গেছো
যে মৃত্যু কাউকে আলোকিত করে না
সত্যিই কি ততটাই মরে গেছো?

*** রিপরিপ- ক্ষীণ/ নিভু নিভু।
আদাম– গ্রাম।

আশা চাক্‌মার কবিতা

হে নতুন প্রজন্ম

হে নতুন প্রজন্ম
শুনেছ কি তোমরা
১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধের ইতিহাসের কথা?
শুনেছ কি তোমরা
এক লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার কথা?

হে নতুন প্রজন্ম
শুনেছ কি তোমরা
জুম্ম জাতির ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা?
শুনেছ কি তোমরা
অকুতোভয় জুম্ম জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা?

হে নতুন প্রজন্ম
শুনেছ কি তোমরা
জুম্ম জাতির সেই অমর বীরদের কথা
শুনেছ কি তোমরা
রাধামন, এম এন লারমা, কল্পনার অমর ইতিহাসের কথা?

হে নতুন প্রজন্ম
শুনেছ কি তোমরা?
লংগদু লোগাং ন্যান্যাচর গণহত্যার কথা
শুনেছ কি তোমরা
সেই সব অত্যাচার-হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসের কথা

হে নতুন প্রজন্ম
শুনেছ কি তোমরা
বাঘাইহাটে হিংস্র হায়েনাদের পদচারণার কথা
শুনেছ কি তোমরা
পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবতা দুমড়ে কাঁদার ইতিহাসের কথা

হে নতুন প্রজন্ম

মনে রেখো
আমি কবি নয়, সত্যের পূজারী
সত্য আমার ধর্ম, সত্য আমার কর্ম
সত্যই আমার প্রাণ।

হে নতুন প্রজন্ম
মনে রেখো
আমি জুম্ম জাতির স্মরণীয় ইতিহাসের কথা
লিখে যাবো
নিঃসংকোচে, জীবনের অন্তিম মূহুর্তে

হে নতুন প্রজন্ম
মনে রেখো
যদি কোন বঞ্চিত মূহুর্তে কোনদিন দাবানল
জ্বলে ওঠে বনে
তারই এক অগ্নিস্ফূলিঙ্গের মত
সেদিন তোমাদেরই জ্বলে উঠতে হবে।

অতি সম্প্রতি প্রকাশের পথে
‘হুচ্’ গল্পসংখ্যা
আপনার লেখাটি
আমাদেরকে মেইল করে দিন